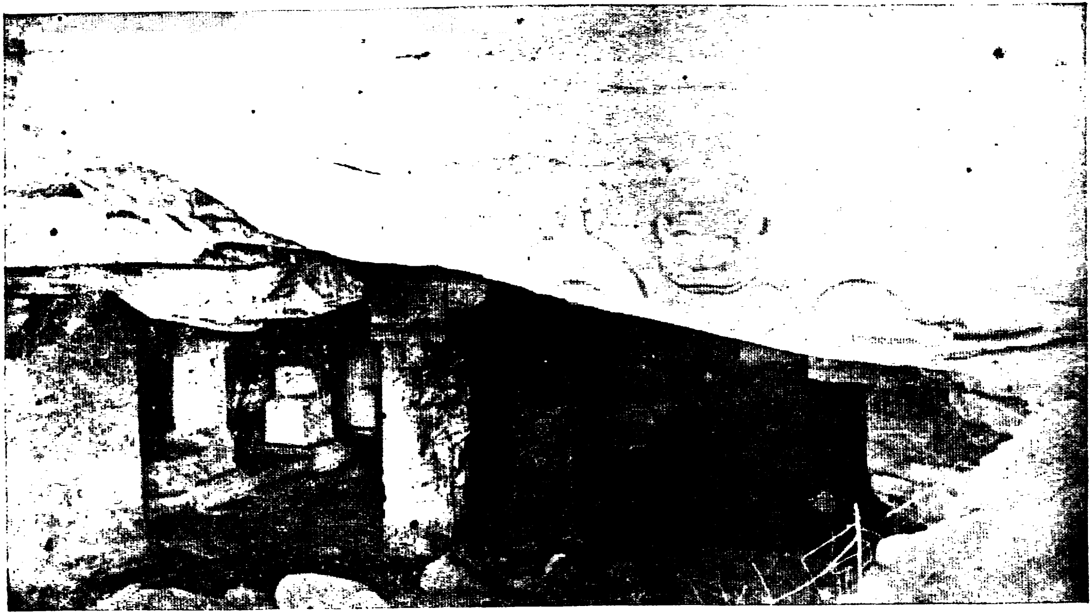


বাগগুহা

বাগগুহা

ও

রামগড়

13 MAR.19
COOCH-BEHAR.

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড্
এলাহাবাদ
১৩২৮

PRINTED BY JAGADANANDA ROY, AT THE SANTINIKETAN PRESS, BIRBHUM. PUBLISHED BY THE INDIAN PRESS LIMITED ALLAHABAD, SOLD AT THE INDIAN PUBLISHING HOUSE, 22, CORNWALLIS ST, CALCUTTA

মূল্য দেড় টাকা

পরম পূজনীয়

শিল্পগুরু

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকটে

আমার এই প্রণামী

অসিত

পরিচয়

পুরাতন যে-ভারতের আদর্শ আধুনিককালের ভারতবাসীদের মনে অনেকদিন থেকে ফুটে উঠেচে সেই হচ্চে প্রধানত ধর্ম্মশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, দর্শনশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, জপতপঃক্লিষ্ট ভারতবর্ষ। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানপরায়ণ, চিন্তাপরায়ণ, ভারতবর্ষই যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তা ইতিহাসের নূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলির দ্বারা অল্প কিছুদিন থেকে আমরা কিছু কিছু অনুভব করতে আরম্ভ করেচি। একটি জিনিষ আমরা বিশেষ করে দেখেচি এই যে, বৌদ্ধযুগের এবং তার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালের ভারতবর্ষের প্রভাব এসিয়ার যেখানে যেখানেই বিকীর্ণ হয়েচে সেখানেই চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য্যকলার অভ্যুদয় হয়েচে। শুদ্ধমাত্র দার্শনিক তত্ত্বালোচনা কখনই কলাবিদ্যার অনুকূল হতে পারে না। কেননা দর্শন রূপলোকের জিনিষ নয় তা' রূপাতীত লোকেরই জিনিষ।

যদি দেখা যায় কোনো একটি নদী যেখান দিয়ে গেছে সেই খানেই তার তীরে তীরে বিশেষ কোনো জাতের গাছ জন্মেচে তাহলে

এই বুঝতে হবে যে, সেই নদীর উৎসের কাছে এই জাতের অরণ্য আছে এবং অরণ্য থেকে বীজ পড়ে নদীর স্রোতে দেশে দেশে সঞ্চারিত হয়েচে। তখনকার দিনে ভারত-সভ্যতায় কলাবিদ্যার চর্চ্চা বিশেষ সজীব ছিল সন্দেহ নেই, নইলে এই সভ্যতার স্পর্শে দেশান্তরে এই বিদ্যার উৎসাহ এমন প্রবল হয়ে উঠ্‌তে পারত না। চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেচে। এসম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিয়েচে যে, আমরা যে কেবলমাত্র চিত্র সৃষ্টি করতে পারচিনে তা নয় প্রাচীন ভারতের চিত্ররচনারীতি আমরা বুঝতেই পারিনে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়িনে। আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি তখনো এই কথাটি বুঝতে পারিনে যে, যে-জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি সেজাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তাছাড়া একথা আমরা মনের দৈন্যবশতই ভুলেচি যে, একটুকরো কাগজে একটুখানি ছোট ছবি যদি সত্য করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে পরিচয় প্রকাশ হবে তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের বড় বড় ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না। অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্য্যের একটি ক্ষুদ কুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই কিন্তু অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার করে চলেচে।

এই কারণেই সম্প্রতি বাগগুহার চিত্রগুলির যে আবিষ্কার ও অনুলিখন হয়েচে সে আমাদের পক্ষে এমন বহুমূল্য। প্রাচীনভারত পঞ্জিকার তিথিবার গণনা করে কেবল উপবাস করে নিজেকে শুকিয়ে মারতনা বারম্বার তার প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত

হওয়া দরকার। আমাদের ইতিহাসে জাতীয় চিত্তের সজীবতার নিদর্শন যতই পাব ততই আমরা বুঝব জীবনের ধর্ম্ম কি, তার প্রকাশ কিরূপ।

ভাগ্যক্রমে বাগগুহার চিত্রের অনুলেখ্যগুলি আমি দেখেছি। দেখে কেবল যে তার আশ্চর্য্য কলা-রস প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করেছি তা নয় সেই সঙ্গে এটুকু প্রত্যক্ষ করেছি যে তখনকার কালের মানুষেরা তাসের সাহেব বিবি ও গোলাম ছিলনা। তখন বৈরাগ্যের শক্তি বড় ছিল কেননা রাগ অনুরাগের শক্তি সজীব ছিল। যারা জগৎকে জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে জানে তারাই ত্যাগ করতে জানে।

একটি কথা বলে আমার ভূমিকা শেষ করি—শ্রীমান অসিতকুমারের এই বইখানি পড়ে আমি খুসি হয়েছি। এর রচনা সরস, সরল, এবং শিক্ষা ও প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল।

১৫ই ভাদ্র ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগগুহা

পথের কথা

পথের কথা

১৩২৪ সালের ভাদ্রমাসে আমার 'বাগগুহা' সম্বন্ধে বিবরণ প্রবাসীতে প্রথম বেরিয়েছিল। আমি তখন গিয়েছিলুম গুহার দেয়ালের চিত্রগুলির (frescoeর) অবস্থা দেখ্‌তে। এবার আমার সহযাত্রী ছিলেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কর। গত জানুয়ারীতে আমাদের গোয়ালিয়ার ষ্টেট থেকে তলব এল বাগগুহার চিত্রগুলি নকল করবার জন্যে।

১৭ই পৌষ, ১৩২৭, ইংরাজী ১লা জানুয়ারী ১৯২১, আমরা কোলকাতা থেকে তিনজনে বম্বে মেলে রওনা হলুম। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন জব্বলপুর-প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। আমাদের অপর সকল সহযাত্রীর মধ্যে ইনায়েৎ খাঁ মহাশয়ের বিষয় কিছু না বলে থাকতে পারচিনা। ইনি যেন ঠিক্ আরব্যোপন্যাসবর্ণিত আচকান পরা, হাতের পাঁচ আঙুলে আংটি, গালপাট্টা দাড়ি, বাবরী চুল, স্থুল-দেহী মানুষটি। তিনি আলবোলা মুখে, পানের ডিবে হাতে, ট্রেনের একটি 'বাঙ্ক' দখল করে বসেছিলেন। আর মাঝে মাঝে "সবজ্ ঘোড়েপর্ চড়্‌কে," "সাহ্‌জাদা" "সাহ্‌জাদীর" নানান "কিস্‌সা' শুনিয়ে সহযাত্রীদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। আমরা খাণ্ডোয়ায় রাত ১টার সময় নেবে গেলুম, তিনি আমাদের Good night করে সেই গাড়ীতেই বম্বে চল্লেন।

খাণ্ডোয়া থেকে B. B. & C. I রেলওয়ের (Malwa Section) narrow gauge-এ রাত ৩টায় সময় আমরা মাউ ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হলুম। ভোরের বেলায় যখন আমরা রেলগাড়ীর জানলা সহসা খুললুম তখন বাইরের দিকে চেয়ে সেখানকার যা দৃশ্য দেখেছিলুম তা একেবারে অনির্ব্বচনীয়। শীতের কুয়াসায় এবং ভোর রাত্রের অন্ধকারে চারিদিক কতক পরিমাণে আচ্ছন্ন থাকায় পাহাড়ের কর্কশতা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তার পরে ট্রেনটি যত ছুটতে লাগল ততই একটির পর একটি ছবি যেন চোখের উপর ভেসে যেতে লাগল। কোথাও অগণ্য হরিণ বনের ভিতর পাহাড়ের গায়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে, কোথাও বা টেলিগ্রাফের তারে বসে নানাবর্ণের পাখীরা ল্যাজ দোলাচ্চে; শীতে ঝরা শুকনো পাতায় পাহাড় গুলি সব আচ্ছন্ন; বনের ভিতর গাছের তলায় অসংখ্য ময়ূর শীতকালের ধূসর রঙকে যেন এক অপূর্ব্ব ভূষণ পরিয়েছে; গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো পড়ে সোনালি ঘাস ও শুকনো পাতাগুলি যেন তসরের মত দেখাচ্চে আর তার উপর ময়ূরগুলিকে দেখাচ্চে যেন জমকালো নীল ও সোনালি রঙ্কার কাশ্মীরী কাজ। ট্রেন থেকে একদিকে পাহাড়টা খুব উঁচু আর একদিকে ঢালু হয়ে একেবারে অতলে তলিয়ে গেছে। এইখানে আমাদের চারটি সুরঙ্গ পথ (tunnel) পার হতে হল। সর্প-গতিতে এঁকে বেঁকে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের মাথায় ট্রেন যখন ছুটল তখন নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। একস্থানে একটি নদী প্রায় ২০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে একেবারে যেন পাতালে প্রবেশ করচে। জলের ধারাগুলি পাহাড়ের মাথা থেকে শতছিন্ন ফুলের মালার মত ঝরে পড়চে।

কুয়াসার পাহাড়ের তলা আচ্ছন্ন থাকায় জলের ধারাগুলি নীচের দিকে মিলিয়ে গেছে। অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটা কালো মেঘের ফাঁকে যেমন সোনার তারের মত উজ্জ্বল দেখায় জলের ধারাগুলি ঠিক তেমনি বোধ হতে লাগল। এই ঝরণাটিকে সেখানে "পাতালপানি" বলে। এই নামের একটি ষ্টেশনও ঝরণার নিকটেই আছে।

খাণ্ডোয়া থেকে মাউ পর্য্যন্ত আমরা এই ভাবে ক্রমাগত ট্রেণে মালবের (Malwaর) মালভূমিতে গিয়ে উঠ্‌লুম। সকাল সাড়ে নটার সময় মাউ পৌঁছলুম। মাউ থেকে ধাড় ৩৩ মাইল ও ধাড় থেকে সর্দ্দারপুর ২৫ মাইল, এই মোট ৫৮ মাইল Motor Service আছে। এই মোটরের পথটা সমস্তটাই মালভূমি (Table-land), কেবল তরঙ্গায়িত পাহাড়ী জমি আর রাস্তার দুধারে বাবলা গাছ, তা ছাড়া গ্রামগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ; এক প্রকার মরুভূমি বল্লেই হয়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই মাড়োয়ারী। একটি গ্রামে হাটের মধ্যে আমাদের মোটর একবার থেমেছিল আমরা দেখলুম এখানকার সাধারণ গরীব দুঃখী সকল মেয়েরাই একপ্রকার চটিজুতো পায়ে দেয়, সে জুতোর গোড়ালিটা চামড়া দিয়ে ঢাকা, সামনের পাঁচ আঙুল খোলা, তাতে পাঁচ আঙুলে পাঁচটি আঙুটি পরা। এই জুতো অনেকটা এসেরিয়ার বহুপ্রাচীন মূর্ত্তির জুতোর মত দেখতে। এ জুতো পরার রেওয়াজ এদেশে যে কবে থেকে এসেচে তা বলা যায় না। এদেশে পথিকদের কাছে এক প্রকার মাটির গোল জলপাত্র দেখলুম, প্রাচীনকালে পেরু দেশেও ঠিক এইরূপ জলপাত্রের প্রচলন ছিল জানা যায়।

ধাড় একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য (Feudatory State)। ধাড়ের

রাজধানীতে একটি প্রাচীন ছোট কেল্লা আছে। সর্দ্দারপুর গোয়ালিয়ার রাজ্যের আমঝেরা জেলার সদর। সর্দ্দারপুরের সুবা সাহেব (Magistrate) আমাদের জন্যে গোযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে টাণ্ডা গ্রাম ১৬ মাইল গোযানে অতিক্রম করা গেল। পাহাড় কেটে যে পথ তৈরী হয় তাকে সেখানে "ঘাট" বলে। টাণ্ডা যাবার পথে সর্দ্দারপুর ছাড়িয়ে প্রথমে একটি "ঘাট" পেলুম। তারপর সেখান থেকে ক্রমাগত আমাদের অনেকগুলি এইরূপ "ঘাট" পেরোতে হল।

এবার আমাদের মালবের কথঞ্চিৎ সমতলভূমি ছেড়ে বন পর্ব্বত লঙ্ঘনের পালা আরম্ভ হ'ল। টাণ্ডায় একটি ডাকবাঙ্গলা ও থানা আছে। সেখানে যখন পৌছলুম তখন চৌকিদার মহাশয় বাঙ্গলোটি চাবি বন্ধ করে কোথায় চলে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এসে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদে সাহেবিয়ানা দেখতে পেলেন না তখন বড়ই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। যাই হোক, সুবা সাহেবের চিঠির জোরে এবং "থানেদার" সাহেবের কৃপায় সেখানে রাত্রিবাস করে আমরা ভোরবেলায় পুনরায় গোযানে বাগগুহা অভিমুখে রওনা হলুম।

টাণ্ডা থেকে বাগ ১৯ মাইল। বাগগুহা পর্য্যন্ত যাওয়ার কোন পাকা রাস্তা নেই, তবে বাগগ্রাম পর্য্যন্ত আমরা পাহাড়ী পাকা রাস্তা পেয়েছিলুম। বাগ গ্রামে একজন তশিলদার বা নায়েব সুবা (Dy. Magistrate) থাকেন। তিনি এই গ্রামের এলাকাভুক্ত স্থানের কর্ত্তা। গ্রামে কয়েকঘর মাড়োয়ারী বেনিয়া বাস করে। এখানকার তহশিলে (কাছারীতে) এই বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেও জল-ঘড়ীতে সময় নির্ণয় করা হয়। একটি জলপূর্ণ বড় পাত্রে

একটি পিতলের বাটি বসানো, আর এই বাটির তলায় সূচ্যগ্রপ্রমাণ ছিদ্র থাকায় ধীরে ধীরে জল ভরে। যখন বাটিটি একেবারে ডুবে যায় তখন ১ ঘণ্টা পূর্ণ হয়েছে অনুমান করা হয়।

বাগ গ্রামে পৌঁছে শুনলুম যে গোয়ালিয়ার Archaeological Department এর Superintendent গার্দ্দে মহাশয় বাগগুহার কাছেই আমাদের জন্যে শিবিরাবাস প্রস্তুত রেখেছেন। বাগ গ্রাম থেকে বাগগুহা চার মাইল পথ। চারবার পাহাড়ী নদী পার হ'তে আমাদের কষ্টের আর অবধি ছিল না। ৭ই জানুয়ারী বিকেলবেলা আমরা তাঁবুতে পৌঁছলুম।

বাগ গ্রামের কাছে বাগীশ্বরীর মন্দির আছে। সম্ভবত বাগীশ্বরীর নামেতেই বাগগ্রামটির নামকরণ হয়েছে। বাগগুহাগুলি আসলে নয়নগাঁও গ্রামের এলাকাভুক্ত। আমাদের তাঁবু পড়েছিল যামিনীপুরা গ্রামে। এই গ্রামটিতে মানকর ও ভীলাড়দের বাস। আমঝেরা জেলায় অনেক ভীল, ভীলাড় ও মানকররা থাকে। এই অসভ্য ভীলেরাই এককালে রাজপুতবীর রাণা প্রতাপের ও মহারাষ্ট্রসিংহ শিবাজীর প্রধান সহায় হয়েছিল। ভীলেরা প্রায় বেশীর ভাগ গভীর বনের মধ্যে বাস করে। পাহাড়ের উপর দু-চার ঘর লোক একত্রে গাছ পাতা দিয়ে কুঁড়ে ঘর বাঁধে। ভীলের ভাষায় এইরূপ ঘরকে "টাপরী" বলে। এই টাপরীতে ঝড়বৃষ্টি কিছুই আটকায় না। এক ঘণ্টার মধ্যে একস্থান থেকে আর একস্থানে ঘর তুলে নিয়ে যেতে পারে। এরা ছেলে বুড়ো সকলেই তীর ধনুক না'হলে এক পা চলে না। জঙ্গলে বাঘের সঙ্গেই এরা এক প্রকার বাস করে। পাহাড়ের গায়ে পাথরের উপর চাষ ক'রে যা সামান্য জোয়ারী শস্য পায় তাতে এবং গরুর দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করে।

সকলেই গরু, মোষ, ছাগল, মুরগী পোষে। ভীলাড় ও মানকরেরা ভীলেদের চেয়ে অনেক পরিমাণে চাষবাসের উপরই নির্ভর করে। বাঘের দৌরাত্ম্যের জন্যে ঘরের চারপাশে কুলগাছের কাঁটা দিয়ে উঁচু ঘন বেড়া তৈরী করে। পালিত পশুদের ও এই রকম একটি বেড়ার মধ্যে রাত্রে রাখে। ভীল, ভীলাড় ও মানকরদের মধ্যে ভীলেরাই কিছু তেজী, এরা অভাবে পড়লে কখন কখন পথে ঘাটে লুটও করে। মানকর ও ভীলাড়, ভীলদের সঙ্গে রাজপুত প্রভৃতি অপর জাতীর মিশ্রণে উৎপন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেখানে এমন উন্নত বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গুহা ও চিত্রগুলি থেকে গেছে, সেখানেই ভারতের আদিমবাসী এই ভীলেরা এখনও পর্য্যন্ত সমান ভাবে বাস করে আসচে কিন্তু কি প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোক, তাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। ঘাম্নিপুরা গ্রামের ভীলেরা তাদের ভক্তদের (পুরোহিতের) নৃত্য আমাদের দেখিয়েছিল। এই ভক্তরা কাঁধ থেকে কোমর পর্য্যন্ত কাপড় দিয়ে যেরূপ ডুগডুগি ঝুলিয়েছিল, বাঘের চিত্রেও ঠিক ঐরূপ ডুগডুগি কয়েকটি মেয়ের কাঁধে ঝোলানো আঁকা আছে।

মহাকালেশ্বরের মন্দির বাগগ্রাম থেকে গুহায় আসার পথেই পড়ে। মন্দিরটি একটি ছোট পাথরের, চূড়ার দিকটা ইটের তৈরী। মন্দিরটির গঠন ও কারুকার্য্য বেশ সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন একেবারে ধ্বংস হয়ে পড়েছে। এই ধ্বংসের মধ্যে এখন অনেক বিষাক্ত সর্প বাস করচে। অনেক সাধু সর্পাঘাতে সমাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি চার বৎসর পূর্ব্বে যে সাধুকে দেখে এসেছিলুম সেইরূপেই তিনিও এবার সমাধিস্থ।

বাগ গুহা থেকে তিন মাইল দূরে একটি নিবিড় অরণ্যের ভিতর গঙ্গামহাদেবের প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সেখানে গাছের নীচে হনুমানজীর একটি বিরাট মূর্ত্তি ও একটি ছোট বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে।

একটি ছোট জলের কুণ্ড (ঝর্ণা) পাহাড়ের ধারে বনের ভিতর আছে, সেটিকে লোকে "পাতালগঙ্গা" বলে। সেখানকার লোকেদের বিশ্বাস যে সেখানে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয়। বাগে যাওয়ার পথে একটি চষা জমির ধারে পাথরের কয়েকটি মাতৃমূর্ত্তি অর্দ্ধ-প্রোথিত আছে। মূর্ত্তিগুলির কারুকার্য্য দেখলে মনে হয় গুপ্ত যুগেরই (Gupta periodর) কোনো মন্দির থেকে এগুলি আনা। বাগগুহার পাথরের সঙ্গে এমূর্ত্তির পাথরের কোন মিল নেই। এছাড়া স্থানে স্থানে রাজপুত সতীদের স্মৃতি ধারণ ক'রে ঘোড় সওয়ারের বা নারীর মূর্ত্তি খোদা সিঁদুর লেপা পাথর অনেক স্থানে দেখা যায়।

১লা মার্চ আমরা বাগ থেকে কাজ শেষ করে ফিরেছিলুম। ফেরবার সময় সোনালি ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ের উপর লাল কচি শালপাতা এবং টকটকে পলাশ ফুল বসন্তের ডালা সাজিয়ে তুলে-ছিল। সোনালি ঘাসের উপর অর্দ্ধেকটা ঘন সবুজ পাতা ও অর্দ্ধেকটা লাল ফুলে ভরা পলাশ গাছগুলি সেখানকার ভীল মেয়ে-দের লাল ওড়না ও নীল ঘাঘরার সঙ্গে যেন ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছিল।

গুহার কথা



বাগগুহার বহির্দৃশ্য

বাগগুহা



গুহার কথা

গুহাগুলি যে পাহাড়টিতে খোদিত সেই পাহাড়টি বাগ গ্রামের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ থেকে দক্ষিণ কোণে বিস্তৃত। সেই স্থানের পশ্চিম দিকটা সমস্ত এবং উত্তর দিকের কতকটা পাহাড়ে ঘেরা, এরই মধ্যে বাগ গুহার ঠিক নীচে দিয়ে ছোট পাহাড়ী বাগ-নদী প্রবাহিত। নদীর দুপাশে কতকটা সমতল জমি। নদীটি শীতকালে একেবারে শুকিয়ে যায়, বর্ষার জল কখন কখন ভরে ওঠে কিন্তু সর্ব্বদা থাকে না। তীরে ছোট ছোট এক প্রকার ঝাউবন।

বাগগুহাগুলির বিশেষত্ব এই যে অজন্তার মত চৈত্য গুহা এখানে একেবারেই নেই। এখানে নয়টি বিহারশ্রেণীর গুহা আছে তার মধ্যে দুটি বাসগৃহ আর একটিকে বলে 'পাঠ-শালা'। সেটি ঠিক্ বিহারশ্রেণীর গুহাও নয় এবং তাকে চৈত্যও বলা যায় না। বোধ হয় সেটি পাঠগৃহ বা অন্য কোনোরূপে ব্যবহৃত হ'ত। এই গুহাগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার গর্ভগৃহে বিরাট ধ্যানি-বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করা নেই, তার পরিবর্ত্তে তাতে বিরাট স্তূপ বিরাজ করচে। চৈত্যগুহার ভজন-পূজনের কাজ সম্ভবত এই গর্ভগৃহেই সমাধা হ'ত। ১নং গুহাটিকে বৌদ্ধশ্রমণদের 'গৃহগুহা' বলা অসংগত নয়। তার সামনে একটি বারান্দা। থামগুলি সব ঝরে পড়ে গেছে। একটীমাত্র প্রবেশদ্বার। ভিতরে একসার থাম

দেওয়া একটী ছোট হল-কামরা। এই ১নং গুহা থেকে ২নং গুহার ব্যবধান সাড়ে ৯০০ ফুট। এই ব্যবধানের মধ্যে এক স্থানে পাথরের গায়ে বাটালীর চিহ্ন আছে। তাতে মনে হয় পূর্ব্বে আরো গুহা ঐস্থানে ছিল বা নির্ম্মাণের চেষ্টা হয়েছিল। বাগের পাহাড়টি নরম বেলে পাথরের পাহাড়, প্রত্যেক বর্ষায় ধসে ধসে পড়চে।

২ নং গুহাটিকে সেখানে "গোঁসাই গুম্ফা" বলে। সেখানে একজন সাধু ছিলেন, তাঁর পাথরের সমাধি-মন্দিরটি গুহার সামনেই অধিষ্ঠান করচে। সেই মহাত্মা গুহায় ওঠবার একটি পাথরের সিঁড়ি রচনা করে ও একটি কূপ খনন করে গুহার উন্নতি করেচেন বটে,কিন্তু তাঁর ধুনির ধোঁয়ায় গুহার চন্দ্রাতপের চিত্র-গুলি একেবারে মসীমলিন হয়ে গেছে। আর এক স্থানে বুদ্ধের খোদিত মূর্ত্তির উপর মাটি চাপা দিয়ে তাতে শুঁড়-যোজনা করে, সিঁদুর লেপে, গণেশ মূর্ত্তি বানিয়ে ছেড়েচেন। এই বিহার গুহাটির সামনের বারান্দার থামগুলি সবই পড়ে গেছে। কিন্তু ভিতরের হলের থামগুলির উপর গোঁসাই ঠাকুর গোবর-মাটি লেপে দিলেও যথেষ্ট কারুকার্য্যের নিপুণতা এখনও টের পাওয়া যায়। হলটি প্রায় ৮৬ বর্গ ফুট এবং তিন পাশে তিন সারিতে ভিক্ষুদের বাসের জন্য ১৮টি কক্ষ আছে। গর্ভগৃহের সামনে দুটি বড় থাম দিয়ে ঘেরা বারান্দার পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে তিনটি মূর্ত্তি এবং পশ্চিমদিকেও ঐরূপ তিনটি মূর্ত্তি খোদিত করা আছে। গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি দেব-দ্বারীর মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বের ও পশ্চিমের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি করে বুদ্ধদেবের দাঁড়ান প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষিণ হাত মাটির দিকে চিৎকরা আশীর্ব্বাদ মুদ্রা এবং বাম হাতে কাঁধের কাপড়



২ নং গুহার বুদ্ধমূর্ত্তি
বাগগুহা



২ নং গুহার দেবদ্বারী মূর্ত্তি
বাগগুহা

ধরা। তাঁর দুপাশের মূর্ত্তিগুলি দেবতা বা ভক্তের বলেই মনে হয়। এই গুহার হল ঘরটিতে ৬টি করে এক-এক সারে স্তম্ভ আছে। পুনরায় ঠিক মাঝখানে চারটি গোল থাম দেওয়া। এই সব থাম পাহাড়ের গা থেকেই কেটে বার করা, জোড়াই কাজ একেবারে নেই। পাহাড়ের উপর ওঠবার একটি সুরঙ্গ পথ এই গুহার মধ্যে একটি ভিক্ষুদের কক্ষের ভিতর দিয়ে আছে। এরূপ গুহার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের মাথায় যাবার রাস্তা অজন্তা বা অন্য কোনো গুহায় আছে বলে শোনা যায় না। পাহাড়ের উপর হয়ত তখন কোন গ্রাম বা লোকালয় ছিল যেখানে যাবার আসবার প্রয়োজনীয়তা থাকায় এইরূপ পথ তৈরী হয়ে থাকবে। এখন কিন্তু পাহাড়ের মাথায় কোনো গ্রামের চিহ্নই পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকে বাগগুহাকে বিরাট-নগরীর পঞ্চপাণ্ডবের আলয় বলে নির্দ্দেশ করে। এই গুহায় এখন একজন সাধু আছেন। তাঁর কাছ থেকে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হবার আশায় (?) তাঁকে খুব "লাড্ডু" "পেঁড়া" চড়ায়। তিনি সর্ব্বদা গঞ্জিকা সেবনে রত থাকেন। সাধু বাবা আমাদের বল্লেন "রামজিকী কৃপাসে লাড্ডু পেঁড়া যো আপ্‌সে আতা হ্যায় সো রামজী (অর্থাৎ নিজে) লে লেতেঁ হেঁ, রামজী (নিজে) কিসিসে কুছ মাঙ্‌তে হেঁ নেহি।" রাত্রে বাঘের উপদ্রবের ভয়ে তিনি প্রকাণ্ড একটা দামামা বাজান এবং একটি উঁচু জায়গায় গুহার মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বাস করেন।

তৃতীয় গুহাটি দ্বিতীয় গুহারই ঠিক পাশেই। তার মাঝে একস্থানে একটি প্রকোষ্ঠ-রচনার সূচনা স্বরূপ বাটালীর চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল। তৃতীয় গুহার সামনে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন নিমগাছ তার বিশাল শাখা-প্রশাখা ভাল রূপে বিস্তার করতে না

পেরে গুহার সামনে সেগুলি নাবিয়ে দিয়ে গুহার মুখে একটি চমৎকার সবুজ পর্দ্দা রচনা করেচে। গুহার প্রবেশ-পথেই একসার বাঘের মুখ (সম্ভবত বৌদ্ধ চিহ্ন স্বরূপ সিংহের মুখ) খোদাই করা হয়েছিল। প্রথমেই একটি হল, দুসারে তিনটি করে ৬টি থাম। হলটি সাড়ে ২৮ বর্গ ফুট। এই হলেরও মধ্যে আর একটি অর্দ্ধ সমাপ্ত হল, দুসারে ৪টি করে আটটি থামে তৈরী। হলের শেষের দিকের কোণগুলি ভালরূপ কেটে বার করা হয়নি। সেখানে বাটালীর মোটা মোটা চিহ্ন গুলি ফুটে আছে। যে দেয়াল থেকে প্রথমতঃ দ্বারগুলি ফুটিয়ে এই অর্দ্ধসমাপ্ত গুহা তৈরী করা হয়েছিল সেই দেওয়ালের উপর একটি প্রকাণ্ড (প্রায় ৭ ফুট চওড়া ২৫ ফুট লম্বা) উড়িষ্যার অক্ষরের মত গোল গোল তুলির টানে লাল রঙের কি যেন লেখা আছে। তুলির টানগুলি যে অর্দ্ধ সমাপ্ত হল-ঘরটি রচনার পূর্ব্বে টানা হয়েছিল তা তার রেখার টানগুলির জের দরজা-গুলির দুপাশে এমন ভাবে টানা আছে যে দেখলে সে বিষয় কোনো সন্দেহই থাকে না। এই লাল রেখা গুলি চিত্র বলে মনে হয় না। তবে কোনোপ্রকার প্রাচীন হরফ কিনা তা বিশেষজ্ঞেরাই বিশেষ ভাবে বলতে পারেন। ৩ নং গুহার প্রবেশ পথের হলটির বামদিকে একটি ছোট বারান্দা ও তার ধারে কয়েকটি কামরা ভিক্ষুদের বাসের জন্য বলেই মনে হয়। ছোট বারান্দার উপরে রঙ করা আল-ঙ্কারিক ছবির চন্দ্রাতপের কতকটা চিহ্ন আছে। সাধু সন্ন্যাসীদের রান্নার ধোঁয়ায় এখন একেবারে কালো হয়ে গেছে। ভিক্ষুদের বাস কক্ষটির বাইরে ও ভিতরে ছবি আছে। এই গুহাটিকে Major Luard সাহেব Proposed Dagoba Chamber কেন বলেচেন জানিনা। Dagoba (স্তূপ) যখন গুহামন্দিরে তৈরী হয় তখন সেটিকে

স্বতন্ত্র পাথরে গেঁথে তৈরী করা হতো না। যে পাথরে গুহাগুলি কেটে ছেঁটে বারকরা হত তারই সঙ্গে Dagoba ও কেটে বারকরা হতো। কিন্তু এই ঘরটিতে যে দেয়াল কেটে Dagoba বার করার সম্ভাবনা ছিল সেই দেয়ালটিতেই বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির ছবি আঁকা রয়েচে। কাজেই Luard সাহেবের অনুমান ঠিক বলে মনে হয় না। কামরাটি সম্পূর্ণরূপে তৈরী নাহলে কখন বুদ্ধদেবের চিত্রগুলি দেয়ালে আঁকা হতনা। তবে সেই ঘরটিতে অনেকগুলি বুদ্ধের দাঁড়ান ছবি আঁকা থাকায় মনে হয় যে এই কক্ষটি হয়ত তখনকার কালে ভজন পূজনের জন্যে ব্যবহৃত হ'ত।

৪নং গুহা বা রঙমহল সাড়ে ৯৩ বর্গ ফুট পরিমাণ, এই হলটি ৫নং গুহার ঠিক গায়েই অবস্থিত। ৫নং গুহা-পাঠশালা লম্বায় সাড়ে ৯৭ ফুট, চওড়ায় সাড়ে ৪৩ ফুট। ৪নং ও ৫নং গুহার বারান্দা প্রায় ২২২ফুট ৩ইঞ্চি লম্বা এবং ১১ ফুট চওড়া। এত বড় বারান্দা আর কোনো গুহায় দেখা যায় না। বারান্দার থামগুলি সমেত সামনের পাহাড়ের খানিকটা ধসে পড়েচে। বারান্দার ভাঙা থামের এবং গুহার প্রবেশদ্বারের সামনে পুঞ্জীকৃত পাথরের স্তূপ এমনভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে যে, তার মধ্যে অনায়াসে যে কোনো বন্যজন্তু বাস করতে পারে। এই ২২২ ফুট বারান্দায় মোট ১৯টি থাম ছিল বলে অনুমিত হয়। এই বারান্দার রঙমহলের দিকের অংশটায় চিত্র আঁকা আছে। ৫নং গুহার দিকের অংশটাতে চিত্র আঁকার জন্যে জমি তৈরী করা হয়েছিল মাত্র কিন্তু তুলির আঁচড় পড়েনি। চিত্রের বর্ণনা পরে করব। এই গুহার পাহাড়ের অবস্থা দেখলে বড়ই দুঃখ হয়। এমন নরম খাজার মত বেলে পাথরের পাহাড় কেটে কেন যে এত বড় কাণ্ড করেছিল তা বলা যায় না।

এই গুহার বাইরে থেকে প্রবেশ-পথের সামনেই গুহার পাশে একটি কুলুঙ্গীর ভিতর বিরাট স্থূলোদর রাজমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এটিকে পেট-মোটা ধনকুবেরের মূর্ত্তি বলা যেতে পারে। এইরূপ লম্বোদর রাজমূর্ত্তি আমরা অজন্তা প্রভৃতিতেও দেখেচি। Luard সাহেব এই পেট মোটা রাজমূর্ত্তিটিকে তাঁর বিবরণে বুদ্ধমূর্ত্তি বলে উল্লেখ করেচেন। প্রবেশ-পথের ধারে নাগেশ ও নাগরাণীর সিংহাসনে-বসা মূর্ত্তি দেয়ালে খোদাই করা আছে। কিন্তু পাথর বড় বেশি নরম হওয়ায় মূর্ত্তিগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। অজন্তায় ১৯নং গুহার বাইরে এক জায়গায় ঠিক্ অবিকল এইরূপ নাগেশ ও নাগরাণীর পাথরের মূর্ত্তি আছে। তবে এখানকার মূর্ত্তি দুটির সঙ্গে অজন্তার মত চামর হাতে সখীর মূর্ত্তি খোদাই করা নেই। রঙমহলের প্রবেশ-দ্বারটি খুব কারুকার্য্যে শোভিত। বারান্দার ছাদ যদিও এখন নেই তবু কোনো কোনো স্থানে তার যে চিহ্ন আছে তাতে আলপনা আঁকা ছাদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। এক সময় চন্দ্রাতপটি ভালরকম আলঙ্কারিক চিত্রে বিভূষিত ছিল।

গুহার ভিতরের হলে প্রবেশের তিনটী দ্বার আছে। দুটি জানালা প্রায় দরজার মতই বড়। এই গুহার হলের মধ্যে উপর থেকে ছাদ সমেত বড় বড় পাথর খসে পড়ে পর্ব্বত-প্রমাণ উঁচু হয়ে পড়েচে। হলটির ৬ফুট অন্তর আটটি ক'রে চারদিকে মোট আটাশটি থাম আছে। এই থামগুলির কার্নিসে সিংহ, হাতী, গরু প্রভৃতি পাথরের মূর্ত্তি খোদাই করা। এই থামের সারের ভিতর হলের মধ্যে পুনরায় চারদিকে দুটি করে মোট আটটি মোটা মোটা গোল থাম পাহাড় কেটেই বার করা হয়েচে। এত থাম থাকা সত্ত্বেও পাহা-

ড়ের ভঙ্গুরতা দেখেই বোধ হয় যে, শিল্পীরা পাথরের ইট তৈরী করে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি মোটা চৌকো চারটি থাম গেঁথে ছাদটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখন সবই বৃথা হয়েচে। পাথর দিয়ে গাঁথা থাম এবং অন্যান্য থাম সমেত ছাদ থেকে বড় বড় পাথর পড়ে হলটীর মাঝখানটী ভীষণ করে তুলেচে। বলা বাহুল্য যে, এই সাড়ে ৯৩ বর্গ ফুট হলের মধ্যে তিনটী দ্বার ও দুটী জানালা ব্যতীত আলো আসবার পথ না থাকায় ভিতরে ভীতি-প্রদ অন্ধকার রাজত্ব করচে। আলো না নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। বাদুড়, পেঁচা, অজগর, সাপ, চিতাবাঘ প্রভৃতির বাস স্থান হয়েচে। হলের ডান দিকে পাঁচটি ও বামদিকে আটটি ভিক্ষুদের বাসকক্ষ আছে। এই কক্ষগুলি আন্দাজ ৮ বর্গ ফুট। কক্ষের দেয়ালে ও ছাদে চিত্র আঁকবার জন্যে প্রস্তুত মাটীলেপা জমি কোনো কোনো কক্ষে আছে।

একস্থানে একটী প্রকাণ্ড জালার মত ঘটের মুখে কচি সবুজ নেয়াপাতি ডাবও আম্রপল্লব আঁকা আছে। ডাবটী এমন নির্ভুল ভাবে আঁকা যে মনে হয় সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী যে সব স্থানে নারকোল গাছ প্রচুর জন্মায় সেই দেশেরই কোনো চিত্রকরের আঁকা ছবি, স্থানীয় লোকের আঁকা নয়। গর্ভগৃহের দুপাশে তিনটী করে ছটী ভিক্ষুদের কক্ষ আছে। গর্ভগৃহে স্তূপটী অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। গর্ভগৃহের সামনে হলের যে থাম আছে তাতে ধ্যানী বুদ্ধের কয়েকটি মূর্ত্তি আঁকা আছে। এই মূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রধানপ্রবেশ দ্বারের দুপাশেই বারান্দার দেয়ালে চিত্র আছে তবে ডান পাশের চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে; বাঁ পাশের প্রায় ৫১ ফুট লম্বা ৭ ফুট চওড়া ছবি এখনও জল দিয়ে

ভেঙ্গালে দেখা যায়। আমরা এই অংশটাই নকল করবার জন্তে বেছে নিয়েছিলুম। এখানে সেই চিত্রগুলিরই যথাসম্ভব বর্ণনা করব। গুহার শেষের দিকের দরজার উপরের দেয়ালে একটী রাণী একটী নীল স্ফটিকের থাম দেওয়া বারান্দায় দুঃখিত মনে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন আঁকা আছে। তাঁর গায়ে মুক্তার মালা ও গহনা পরা। তাঁর সামনে একটী মেয়ে এক হাতে কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে আর এক হাতে ভঙ্গী করে যেন কি মনোবেদনা জানাচ্চে। বারান্দার ছাদের দুপাশে দুজোড়া নীল রঙের গোলা পায়রা বসে আছে। কপোত কপোতীর ছবিতে পাখী আঁকবার শক্তি ও শিল্পীদের অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছবিটীর শেষে টানা একটী প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরের পরেই দুজন রাজবেশী, একজনের মাথায় বড় মুকুট তিনি সামনে বসে; অপর জনের মাথায় ছোট মুকুট ইনি তার পিছনে বসে আছেন। এই রাজপুরুষদের পাশে একটী নীলবর্ণের বামন দূত আঁকা। আর তাঁদের সম্মুখে তাঁদের সামনা-সামনি মুখ করে আরো দুজন বসে আছেন। রাজন্যদের মত এঁদের বসবার গদী বা আসন নেই। তাঁরা সকলে পরস্পর যেন কি এক গভীর বিষয় গবেষণা করচেন। ছবিতে মূর্ত্তিগুলির হাতে, মুখে চোখে এমন একটী সরসতা আছে যা সচরাচর দেখা যায় না। তার পরের দৃশ্যে কয়েকটী সাধু আকাশ-পথে যেন উড়ে চলেচেন। তাঁদের কারো কারো হাতে পদ্মফুলের ডালা সাজানো রয়েচে। এই ছবির ঠিক নীচে কতকটা সেতারের মত বাদ্যযন্ত্র হাতে একটী মেয়ে এবং আরো চারটী মেয়ের মুখ ও হাতের কিছু কিছু অংশ ছাড়া সবই ঝরে গেছে। প্রত্যেক



রংমহলের নর্ত্তকীর চিত্রের মুখ



করকমল

মেয়ের মুখের ধরণ (Type) ভিন্ন রকমের। গায়ের রঙ খয়রী। এই ছবির পাশে পারস্য ধরণের কলার দেওয়া ছিটের জামা ও পায়জামা পরা একটি লোক হাতের উপর হাত রেখে উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করচে, তার চোখের দৃষ্টি একেবারে যেন কোন্ দেশে রয়েচে। তার সামনে একটি উচ্চ আসন, তার উপরে নীল, হলুদ, ডুরে কাপড়ের তাকিয়া এবং তার মধ্যে এক-প্রকার ফলের মত সামগ্রী থালায় সাজান আছে। পিছনে ও দুপাশে সেই নৃত্যরত লোকটিকে ঘিরে নিটোল কালো, বাদামী ও খয়রী রঙের কতকগুলি মেয়ে ডুরে সাড়ী ও ছিটের জামা পরে মৃদুতালে নৃত্য করচে। কেউবা ছোট ডুগডুগী কাঁধ থেকে কোমর পর্য্যন্ত কাপড় দিয়ে ঝুলিয়ে বাজাচ্চে, কেউ বা লোহার দুটি করতাল, কেউবা মন্দিরা বাজিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিচ্চে এবং বিচিত্র ভঙ্গীতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়চে। ছবির এই অংশটাই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। জল দিয়ে ভেজালে এই ছবিগুলি একেবারে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। পারস্য নর্ত্তকের সামনে থালায় সাজান দ্রব্যসম্ভার রাখা থাকায় মনে হয় অতিথি-সৎকারের জন্যেই যেন আয়োজন প্রস্তুত রাখা হয়েচে। (কিম্বা কোনো বিদেশী দূত কর্ত্তৃক আনীত সামগ্রী সযত্নে এইরূপ ভাবে আসনের উপর রাখা হয়েচে।) ঠিক এই নর্ত্তক ও নর্ত্তকীদের পাশেই এই ধরণের আরো একটি ছিটের পারস্য পোষাক পরা নাচিয়ে ও তার সামনে আসনে থালা ও পিছনে তাকে ঘিরে নৃত্যগীতরতা মেয়েদের ছবি আঁকা আছে। এ ছবিগুলির শেষেও একটি প্রাচীর এঁকে আলাদা করা হয়েচে। তারপরে প্রায় ২০ ফুটের উপর লম্বা এবং ৭ ফুট চওড়া একটি শোভাযাত্রার ধারা-

বাহিক (Panoramic) চিত্র আছে। প্রথমে অশ্বারোহীরা, তারপর হাতীর পিঠে চড়া লোকলস্কর। ঘোড়ায় চড়া ও হাতীর পিঠে চড়া লোকেদের গায়ে ছিটের জামা। মাথায় খোঁপার মত ছিটের কাপড় জড়ানো। অশ্বারোহীর মধ্যে একজনের মাথায় ছত্র চামর ধারণ করা হয়েছে, তাতেই তাঁকে রাজা বলে মনে হচ্চে। তাঁর গায়ে ছিটের জামা; ছোট জাঙিয়া পরা। হাতীতে চড়া লোকের মধ্যে একটি বিশালবপু পুরুষ আছেন তাঁর মাথায় শ্বেত ছত্র ও চামর ধারণ ক'রে একটি লোক আছে। তাঁর গায়ে কোনো আভরণ বা অলঙ্কার নেই, বিষণ্ণভাবে দক্ষিণ হস্তে নীল কমল উপুড় করে ধরে একলা একটা হাতীর পিঠে বসে আছেন, হাতীর মাহুত নেই। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তখনকারকালে সকল বিদ্যার সঙ্গে হাতী চালান বিদ্যাও রাজারা জানতেন। ছবিটা দেখলে মনে হয় রাজা প্রব্রজ্যা নিয়েচেন। অশ্বারোহীদের ও হাতী চড়া লোকদের মুখে নানান ভাব তো ফোটানো আছেই তা ছাড়া ঘোড়া, হাতীর চোখের ভাবও ভারি সুন্দর। তেজী ঘোড়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে চোখের ভঙ্গী প্রভৃতি ঠিক যেরূপ হওয়া উচিত তা যথাযথভাবে আঁকা আছে *। পঞ্চম শতাব্দীতে পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোথাও চিত্রকলা এতদূর ভাবমণ্ডিত হয়েছিল বলে জানা নেই।

হাতীর মিছিলের মধ্যে দুটি হাতীতে তিনটি করে ছটি মেয়ে ঢোল পিঠে বেঁধে চলেচে। হাতীচড়া মেয়েগুলির ভীত চকিত ভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাবধান হয়ে আঁকড়ে ধরে বসার ভঙ্গী

* মহাবংশ পাঠে জানা যায় সিন্ধুদেশীয় তেজী ঘোড়ার প্রচলন ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ছিল।

ভারি মজার। এই সব হাতী ও ঘোড়ার মিছিলের গতি নাচের দৃশ্যের দিকে। তারপরে একটি প্রকাণ্ড চৈত্য-গৃহ আঁকা আছে। বাগের পাহাড়ে চৈত্য গুহা না থাকলেও চিত্রে চৈত্য আঁকা আছে। এই চৈত্যের অপর পাশে দাঁতে কাপড় জড়ানো কয়েকটি হাতীর মিছিল পূর্ব্বের মিছিলের বিপরীত দিকে যাচ্চে। কতকগুলি অশ্বারোহীও আছে। তারপর একটি উদ্যানের মত একটি বৌদ্ধ 'আরাম' (Park) বলেই মনে হয়। সেখানে অশোক গাছের তলায় একটি সাধু মুণ্ডিত মস্তকে বসে কি যেন ভাবচেন। এই লোকটীকে সহসা সাধু বলে মনে হয় বটে কিন্তু তাঁর গায়ে ছিটের জামাও আছে। তাঁর সামনে কোন একটী লোক বসেছিল বলে মনে হয়। একটী মঙ্গল-কলস গাছের নীচে আছে। আর গাছের উপর থেকে কাপড় ঝোলানো আছে। অশোক গাছটীকে এই ভাবে সজ্জিত করা হয়েচে বলে মনে হয়। অশোক গাছটীর গায়ে একটী লতা জড়ানো আছে *। ছবিগুলিতে এককালে কোনোরূপ বার্ণিসকরা ছিল বলে মনে হয়। কেননা ৫ নং গুহার দ্বারের উপর ছবিতে কিছু কিছু চক্‌চকে বার্ণিস এখনও আছে। এই গুহার অপর সব চিত্রের বিবরণ পরে দেব।

৫ নং গুহাটীতে (পাঠশালায়) দুসারে আটটী করে গোল থাম। ৪ নং গুহার থামের মত কারুকার্য্যের বাহার এতে নেই। ৫ নং গুহা থেকে ৬ নং গুহায় যাবার একটী কক্ষ-পথ আছে। এই কক্ষ-পথটী দৈর্ঘ্যে ১৭ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৩ ফুট ৩ইঞ্চি। ৬ নং গুহার বাইরের বারান্দার কোনো চিহ্নই

* লতা জড়ানো স্তূপ ও গাছের বর্ণনা মহাবংশ গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাবংশে সেই লতার নাম আদারী লতা (Adari Creeper) উল্লেখ আছে।

এখন নেই। হলের ভিতরে দুসারে ছটী থাম ছিল এখন সবগুলিই ঝরে পড়েচে। গুহাটী আন্দাজ ৪৮ বর্গ ফুট। গর্ভগৃহ ছাড়া দুপাশে চারটী কক্ষ আছে। গর্ভগৃহের স্তূপটী একেবারে ধরাশায়ী, অতিকষ্টে স্তূপ বলে নির্ণয় করা যায়। এই গুহায় ভাঙা থামের গায়ে কিছু চিত্রের চিহ্ন আছে, হয়ত গুহাটীতে একসময় ছবি আঁকা হ'য়েছিল। এই গুহায় একটী কক্ষে বাঘের ভুক্তাবশেষ জীব জন্তুর অস্থি কঙ্কালের স্তূপ এবং তাদের বাসের আর আর অনেক নজির আমরা দেখলুম। অজগর সাপও শুনলুম সেখানে এখন নির্ব্বিঘ্নে বাস করে। গুহার ভিতরও পুঞ্জীকৃত পাথর জমে আছে। সেগুলি দেখলে স্বপ্নপ্রয়াণের ঋষিকবির পাতাল-পুরীর—

"অট্টালিকা মহাকায় পার্শ্ব পড়িয়াছে ভাঙি
উচ্চ শির মহত্ব শিথায়
ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায়
আছেন কাল-পেঁচক থামের আগায়।"......

প্রভৃতি কবিকল্পনাগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

৭ নং গুহাটীকে ২ নং গুহার হুবহু নকল বল্লেই হয়। এখন একেবারে ধ্বংস পেয়েচে। আমি চার বৎসর পূর্ব্বে যা দেখে এসেছিলুম এবার তার চেয়ে অনেক বেশী ভাঙাচোরা দেখে এলুম।

৮ ও ৯ নং গুহাদুটীর ভিতর প্রবেশ করা যায় না। এখন সেখানে বাঘের আবাস। পাহাড়টী সেখানে এমনভাবে গুহার উপর থেকে বসে গেছে যে তার মধ্যেই গুহাদুটী চাপা পড়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে শিল্পের ইতিহাসের অনেক তথ্য গুহায় নিহিত রয়ে গেছে।

চিত্রকলা

চিত্রকলা

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে বিদেশী প্রভাব

আমাদের দেশে প্রাচীন যুগের যে সব স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন আছে সেগুলির মৌলিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় সমালোচকেরা সন্দিহান হন। তাঁরা এদেশের আর্টের নিদর্শন গুলিকে হয় গ্রীস বা ইজিপ্ট, নয়ত পারস্য থেকে আমদানী করেছিল বলে মনে করেন। ভারতের সঙ্গে পারস্য, ইজিপ্ট ও গ্রীসের যে বহু প্রাচীনকাল থেকে একটা যোগ ছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কারণেই এবং এদেশে অপর দেশের আর্টের কিছু নজির সে সময় এসে থাকলেও * সমগ্র ভারতের আর্টকে যে তাতে অধিকার করে বসেছিল বা ভারতে তার পূর্ব্বে আর্ট ছিল না একথা বলা যায় না। জগতের শিল্পের মধ্যে ভারতের শিল্পের যে একটা স্থান আছে সে কথা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না। (ভারতের প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি জগতের একটা শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ বলে সম্প্রতি তেরোজন বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পী ও সমঝদারেরা যে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেছেন এ বিষয় স্মীথ সাহেবের The History of Fine Art in India & Ceylon Page. 4. দ্রষ্টব্য।) ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাস কোনোরূপ লিপিবদ্ধ করা না থাকলেও তার শিল্প ও সাহিত্য যুগে যুগে তার চিন্তা ও সভ্যতার ইতিহাস রেখে গেছে। শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার সাহিত্য ও

* গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভাব।

চিন্তাশক্তির পরিচয় ভারতবর্ষের মুনিঋষিরা উপনিষদ, বেদ, পুরাণ প্রভৃতিতে যা রেখে গেছেন তা কেবল মাত্র ভারতবাসীর নয় সমস্ত পৃথিবীর গৌরবের সামগ্রী। প্রাচীন সাহিত্যের মত শিল্পকলার অত বেশী পুরাতন নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত আবিস্কৃত না হলেও পুরাণাদিতে শিল্পকলার বিষয় যথেষ্ট উল্লেখ আছে দেখা যায়। ইউরোপীয় যবনদের (এলেকজেণ্ডার প্রভৃতির) ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে এদেশে আর্ট ছিল না যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হলে তাদের এদেশে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শিল্পকলা মৌলিকভাবে একালে সহসা এতদূর কি করে পরিণত হয়ে গড়ে উঠেছিল তা জগতের শিল্প-ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলতে হয়। এ যেন কতকটা যাদুকরের মাটীতে বীজ না পুঁতেই ফল ফুল সমেত পরিণত একটী গাছের আবির্ভাব হওয়া! আসলে বহু প্রাচীনকাল থেকে শিল্পকলার চর্চ্চা না হলে দেশের বিশেষত্বপূর্ণ এমন মৌলিক শিল্পকলা ভারতবর্ষে কখন সহসা গড়ে উঠ্‌তে পারত না। ভারতবর্ষে গ্রীক প্রভাব যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে এসেছিল, সে সকল দেশের (গান্ধারের) শিল্পকলা তাই প্রাণহীন ও আড়ষ্ট। দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে, দেশের শিল্পীদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও চিন্তার সঙ্গে কোথাও খাপ না খাওয়ায় গান্ধারের আর্ট এমন আড়ষ্ট এমন নীরস যে, তারদ্বারা দেশের শিল্পীরা কি একালে কি সেকালে কোনো কালেই বিশেষরূপে আকৃষ্ট হ'তে পারেননি। ভারত শিল্পের নবজাগরণের প্রবর্ত্তক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেচেন:—"গ্রীক দেবতার বীজে ভারত শিল্পের জন্ম নয়, কিছুতেই নয়; তেঁতুলের বীজে আর আমের বীজে যতখানি তফাৎ তার সঙ্গে সমান তফাৎ গান্ধার শিল্পে আর ভারত শিল্পে, এই হ'ল দরদীর

প্রমান।" * প্রকৃতির (natureএর) সঙ্গে চিন্তার যোগ না হলে কখন ছন্দ মেলেনা, খাপছাড়া হয়ে যায়। তাই দেখা যায় গ্রীকদের চিন্তা (তাদের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে) ও প্রকৃতির (natureএর) সঙ্গে এদেশের চিন্তার ও প্রকৃতির ছন্দোবদ্ধ না হওয়ায় এদেশের গ্রীক বা গান্ধারের আর্টে (তাদের স্বদেশের) ভেনাসের মত অপূর্ব্ব কিছুই রেখে যেতে পারেনি ;—গ্রীসের আর্টের বিকৃত নকলই যা কিছু রেখে গেছে। আবার যেখানে ভারতীয় শিল্পকলা ভারতের নিজের চিন্তায় (ধর্ম্মে ও কর্ম্মে) উদ্বোধিত হয়ে ভারতীয় আব-হাওয়ায় সুর বেঁধেচে, সেখানে চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে অলঙ্কৃত করে তুলেচে। তার ফলে সুদূর বালীদ্বীপে, যবদ্বীপে, কাম্বোডিয়ায়, সিংহল ও ভারতবর্ষের বাহিরে নানাস্থানে ভারতশিল্পের নিদর্শন আজ এমন ছড়ানো আছে দেখতে পাচ্ছি।

বাগ ও অজন্তার চিত্রে পারস্য প্রভাব

যাই হোক, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে গ্রীক প্রভাবের কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উল্লেখ করলেও অজন্তা বা বাগের প্রাচীন চিত্রকলায় গ্রীক প্রভাবের কথা তাঁরা কেহ এ পর্য্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে বলেন নি ; তবে, কেহ কেহ পারস্য প্রভাব অনুমান করে থাকেন। ফার্গুসান সাহেব বাগের চিত্রে দুটী পারস্য পোষাক পরিহিত নর্ত্তক ও পায়জামা কোর্ত্তা পরিহিত অশ্বারোহীদের চিত্র দেখে বাগের চিত্রগুলিকে পারস্য চিত্র বলে অনুমান করেন। তিনি বলেন যখন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মধ্যভারত শক বা যবনদের দখলে কিছুকাল ছিল তখন তাঁরা তাদের দেশ থেকে এই চিত্রকলা হয়ত আমদানী করেছিল। এমনকি তিনি বাগের চিত্রের

* রস ও নিরস, ভারতী, পৌষ ১৩২৭।

সমসাময়িক পারস্য চিত্রের বিষয় উল্লেখ ও তুলনা করে বলেচেন যে এতদুভয়ের আঁকার ধরণের (styleএর) খুব মিল আছে ;* কিন্তু আরো আধুনিক লেখক স্মীথ্ সাহেব অজন্তার প্রাচীনচিত্রে পারস্য পোষাক পরা লোকের ছবি দেখে পারস্য থেকে চিত্রকলা আমদানী হয়েছিল বলে অনুমান করলেও অজন্তার সমসাময়িক পারস্য চিত্রকলার কোনো নজির এপর্য্যন্ত আবিস্কার না হওয়ায় এ বিষয় স্পষ্টীকরে কোনো মত প্রকাশ করেন নি। † ফার্গুসানের তথাকথিত অজন্তা বা বাগের সমসাময়িক পারস্য চিত্রকলার প্রত্যক্ষ নজির যখন পাওয়া যায় না তখন কয়েকটী পারস্য লোকের ছবি আঁকা আছে বলেই বাগ বা অজন্তার চিত্রগুলিকে পারস্য থেকে আমদানী করা হয়েছিল একথা কোনোমতেই বলা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

পারস্য ও আফগানিস্থানে ভারত-শিল্পের প্রভাব

যবনদের দেশে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্পকলা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুদূর আফগানিস্থানে যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমান বেগলার সাহেব কর্ত্তৃক আবিস্কৃত আলি-মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্তূপ ও পাথরের বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায়। সেই স্তূপের নিকট প্রাপ্ত মুদ্রা, মথুরার প্রাচীন শিলালিপিতে যে বাসুদেব রাজার উল্লেখ আছে সেই রাজার বলে জানা গেছে। মথুরার বাসুদেব রাজার অধীনেই আফ্গানিস্থান অশোকের পরবর্ত্তী কোন এক সময়ে ছিল বলে জানা যায়। ‡

* History of Indian Architecture., Page 161. (1. Ed.)

† History of Fine Art in Indian and Ceylon., Page 287.

‡ Cave Temples of India., Page. 200.

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে ইটালীয় প্রাচীন সমসাময়িক চিত্রের তুলনা

ইটালীর সমসাময়িক চিত্রের সঙ্গে অজন্তার চিত্রের তুলনা করতে গিয়ে স্মীথ সাহেব তাঁর পুস্তকে গ্রীফিথস্ সাহেবের কথার সমর্থন ক'রে তাঁর জবানী তুলে দিয়েছেন। গ্রীফিথস্ বলেন "চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে Ambrogio Lorenzettiর আঁকা একটি Nun এর ছবির (frescoeর) টুকরো যা' Sienese Room এ National Galleryতে রাখা আছে তার সঙ্গে অজন্তার ছবির বর্ণ-বিন্যাস ও কলাপদ্ধতির (Techniqueএর) খুব মিল আছে।" প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ফার্গুসান সাহেবও ইটালীর চিত্রের সঙ্গে অজন্তার চিত্রের তুলনা করতে গিয়ে চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের ইটালীর Orcagnaএর চিত্রের তুলনায় অজন্তার চিত্র অনেক অংশে ভাল বলেচেন। হ্যাভেল সাহেব ও চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের আঁকা ইটালীর Giovanni Belliniর মাতৃমূর্ত্তির ছবির সঙ্গে সপ্তম খৃষ্টাব্দীতে আঁকা ১৭নং গুহার অজন্তার ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সামনে মাতাপুত্রের ছবিটির ভাবগত ঐক্য আছে দেখিয়েচেন। এ থেকে দেখা যায় প্রায় সকল বিশেষজ্ঞেরাই ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার সঙ্গে ঠিক সমসাময়িক ইটালীয় চিত্রকলার তুলনা করতে পারেন নি। কেননা, খৃঃ পূঃ প্রথম থেকে নবম খৃষ্টাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন চিত্র যা আঁকা হয়ে গেছে তার তুলনায় সমসাময়িক ইটালীয় চিত্রকলা নিতান্ত অপরিণত; তখন ইটালীয় চিত্রকলার শৈশব অবস্থা বলা চলে। ইটালীর চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের পরিণত চিত্রকলার সঙ্গেই একমাত্র ভারতীয় প্রাচীনতম (চতুর্থ শতাব্দীর) চিত্রকলার তুলনা করা চলে। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীনকালে ইউরোপে

* The History of Fine Art in Indian and Ceylon., Page, 292

চিত্রকলা উৎকর্ষলাভ করবার বহুপূর্ব্বেই আমাদের দেশে চিত্রকলা এগিয়ে গিয়েছিল। বাগের চিত্রে আমরা ঘোড়া, হাতী, মানুষ প্রভৃতির মূর্ত্তি-চিত্রের যেরূপ উৎকৃষ্ট পরিণতি দেখতে পাই তাতে সেই প্রাচীন যুগের চিত্রকলা পরবর্ত্তী যুগের অপর দেশের আর্টকেও যে জাগিয়ে তোলবার ক্ষমতা ধারণ করত তা সহজেই বোঝা যায়। ভারতের বাইরে মধ্য-এসিয়ায় 'খোটানে' ভারত শিল্পের যে জের গিয়ে পৌছেছিল তা এখন জানা গেছে। *

ইউরোপীয় চিত্রকলা ও ভারতের চিত্রকলা

প্রাচীন যুগে অজন্তা ও বাগের সমসাময়িক কালে গ্রীসের চিত্রকলা Pompeii তে একমাত্র উৎকর্ষ লাভ করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তার ভাব ও কলারীতির (Technique এর) সঙ্গে ভারতবর্ষীয় কোন চিত্রকলার কোনো অংশে মিল নেই। Pompeii এর চিত্রে একটি জিনিষের তুলনায় আর একটি জিনিষ ঠিক্ কত বড় আকারে ছবিতে হবে এই মাপ বা প্রমাণ ভালরূপ জানা ছিল না বলেই মনে হয়। কেননা Paris on Mount Ida চিত্রে, চিত্রের অগ্রভূমির (Foreground এর) গরু ও অপর জিনিষগুলির তুলনায় দূরের দিগন্তরালে দণ্ডায়মান ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের চিত্র অসম্ভব বড় করে আঁকা আছে। অজন্তা বা বাগের চিত্রে এরূপ ধরণের ভুল বড় একটা চোখে পড়ে না।

চীন ও জাপানে ভারতীয় বৌদ্ধ চিত্রকলার প্রভাব

চীন ও জাপানের প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন চিত্রের খুব মিল আছে। ভারত শিল্প চীন ও জাপানে গিয়েছিল জানা যায়। Stephen. W. Bushell তাঁর Chinese Art নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে চীন দেশে প্রচলিত একটী প্রবাদ গল্প উল্লেখ করে লিখেছেন

* Ancient Khotan, by M. Aurel Stien.

যে ৬৭ খৃষ্টাব্দে চীনরাজ "মিঙ্‌তি" প্রথমে "লো ইয়াঙ্‌কে" ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ ও চিত্রাদি আনবার জন্য পাঠান। লোইয়াঙের সঙ্গে দুজন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও একটি শ্বেত অশ্বের বোঝাই করা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ, মূর্ত্তি ও নানাপ্রকারের বৌদ্ধ গাথার চিত্র চীন দেশে প্রথমে যায়। "পিমাস্থ" কথাটার অর্থ হচ্চে শ্বেত অশ্ব। শ্বেতঅশ্বটির নামেই একটি নতুন মন্দির স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষ থেকে আনা নানাপ্রকার চিত্র মন্দিরের দেয়ালে এঁকে শোভিত করা হয়। এই গল্প থেকে ভারতবর্ষের কলা বিদ্যা কিরূপে চীন দেশে নীত হয়েছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চীনেদের নিজেদের বিশেষত্বের দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে কিরূপে তাদের আর্টটা গড়ে উঠেছিল তা জানা যায়। জাপানে "হোরিউজি" মন্দিরের দেওয়ালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর যে সব চিত্র আছে সেগুলি দেখলে অজন্তার নকলে আঁকা ছবি বলেই বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। *

ভারতের বাহিরে ভারতীয় চিত্রের প্রভাব

জাপান ও চীন ছাড়া মধ্য-এসিয়া এবং তুর্কিস্থানেও অনেক মহাযান বৌদ্ধযুগের প্রাচীন চিত্র মাটির ঘরের দেয়ালে আঁকা আছে, আবিস্কৃত হয়েচে। মরুভূমির বালির মধ্যে আচ্ছাদিত থাকায় চিত্রগুলি এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ জখম হয়নি। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম কেহ কেহ বলেন বেরায়ের নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বুদ্ধের জন্মের ৪০০ বৎসর পরে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তান্ত্রিকতা ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করায় বৌদ্ধধর্ম্ম কতকটা হিন্দুধর্ম্ম ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। খোটান মিরান প্রভৃতি মধ্য-এসিয়ার (চীন-তুর্কিস্থানের) প্রাচীন চিত্রে তাই বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মূর্ত্তিও আঁকা আছে

* Painting in the Far East., Page, 98.

দেখা যায়। মধ্য-এসিয়ার চিত্রকলা ভারতের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে হিমালয়ের ঠিক পরপারে থাকায়, সেটা মূলত ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে সেখানে আমদানী হলেও তার পূর্ব্বদিকে চীন ও তুর্কি-স্থানের এলাকাভুক্ত হওয়ায় একেবারে একটা খিচুড়ি ভাবাপন্ন হয়েপড়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে চীন ও তুর্কি-ভাবের সংমিশ্রণটা কতকটা তেলে জলে মেশানোর মত হয়ে পড়েচে। নানান দেশের শিল্পের যোগাযোগে যদি সহজে অভিনব একটী চিত্রকলা আপনা থেকে গড়ে উঠতো তাহলে চিত্রজগতে তার মূল্য আরো অনেক বেড়ে যেতো এবং এইরূপ নানাদেশের আর্টের সমাবেশের মধ্যে অমিলের দাগটা এমন প্রখর ভাবে চোখে পড়ত না।

ভিত্তিচিত্রের (Frescoeর) জমী তৈরীর ভারতীয় রীতি

ভারতে প্রাচীনকালে চিত্র যেরূপ ভাবে তৈরী জমীর উপর আঁকা হ'ত গ্রীক কর্ত্তৃক অধিকৃত হবার বহু পূর্ব্বে ইজিপ্টেও কতকটা সেইরূপেই চিত্রের জমী তৈরী হ'ত বলে জানা যায়। ইউরোপীয় ভিত্তিচিত্রের জমী একেবারে স্বতন্ত্র ধরণে তৈরী হ'ত; তার সঙ্গে ভারতবর্ষের ভিত্তিচিত্রের জমীর কোনো মিল দেখা যায় না। ভারতে প্রধানত দুপ্রকারের জমী তৈরী করবার নিয়ম দেখা যায়। প্রথমে পাথরের দেয়াল যথাসম্ভব মসৃন করে নেওয়া হ'ত। তারপরে গোবর মাটী তুঁশ বা পাটপচা (বাগের চিত্রে কাঠের আঁশও আছে) একত্রে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে সেই পাথরের দেয়াল আধ ইঞ্চি বা কখন কখন (অসমান জমী ভাল করে সমান করবার জন্যে) ২।৩ ইঞ্চি পুরু ক'রে অস্তর লাগান হ'ত। (ছাদের নীচে ceiling এ চিত্র আঁকতে হলে পাথরের দেয়াল যথাসম্ভব এবড়ো খেবড়ো

রাখা হ'ত।) শেষে মাটীর অস্তরের উপরে ছাঁকা মাটীর খুব পাতলা একটী প্রলেপ দিয়ে জমীটিকে যথাসম্ভব সমান করে নেওয়া হ'ত। সব শেষে উল্লিখিত তৈরী জমীর উপরে সাদা রঙের (চুন নয়, সম্ভবত খড়ি বা শাঁখের গুড়ো থেকে তৈরী সাদা) ২।৩ বার পাতলা করে একটী অস্তর ভাল করে লাগান হ'ত তারপর শুকালে তবে একটীর পর আর একটি করে অস্তর দেওয়ার রীতি ছিল। এই প্রকারে জমী তৈরী করা হয়ে গেলে সেটী ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে শঙ্খ বা পাথর দিয়ে ঘসে জমী মসৃন করে নেওয়া হ'ত বলে মনে হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ছবির জমী তৈরী করতে হলে পাথরের দেয়ালে মাটী প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হ'ত না। পাথরের দেয়ালের উপর ডিমের খোলার মত পাতলা করে ২।৩ বার সাদা রঙের অস্তর দেওয়া হ'ত। মধ্যপ্রদেশে সুরগুজা রাজ্যের মধ্যে রামগড়ে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীন চিত্রে আমরা এইরূপ পলস্তারা ব্যবহৃত হয়েছে দেখেচি। অজন্তায় ও বাগে কচিৎ ২।১ স্থানে উক্ত প্রকারের Frescoe আছে। বাগে রঙমহলের বারান্দার চিত্রে যে মাটী দিয়ে জমী তৈরী করা আছে সে মাটীর রঙ এত লাল যে দেখলে ইটের গুড়ো বলে ভ্রম হয়। কিন্তু ঐসব মাটী নিকটবর্ত্তী যে পাহাড় থেকে আনা হয়েচে সেখানে ঠিক ঐরূপ মাটী এখনও প্রচুর পরিমানে আছে আমরা দেখেচি। বাগে ৪নং গুহার বারান্দার ভাঙা থামের গায়ে এবং অপর অপর গুহার থামে যেখানে যেখানে পাথরের কারু-কার্য্য ভেঙে গেছে সেখানে চুনবালির পলস্তারা দিয়ে সেগুলি তৈরী করা আছে দেখেচি। এই চুনবালির পলস্তারা বহু পুরাতন বলেই মনে হ'ল। অষ্টম শতাব্দী থেকে চুনবালির পলস্তারার কাজ

আমাদের দেশে যে বরাবর চলে আসচে তা এথেকে জানা যায়।

ইউরোপীয় (বা ইটালীয়) ভিত্তিচিত্রের জমী তৈরীর রীতি চিত্রের জমী তৈরীর কিরূপ ছিল এবিষয় আলোচনা করলে ইউরোপীয় রীতি ভারতবর্ষীয় frescoeর সঙ্গে তার কতটা এবিষয় পার্থক্য ছিল তা জানা যাবে। ইটালীতে দুই প্রকা-রের ভিত্তিচিত্র আঁকার রীতি ছিল। এক প্রকার Frescoe Secco এবং অপরটী Frescoe Buono অর্থাৎ খাঁটী Frescoe বলা হয়। প্রথমটী Dry process দ্বিতীয়টী Wet processএর frescoe।

জমী তৈরী করবার রীতি (Albaria Opera) সম্বন্ধে ইটালীয় একটি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে প্রথমে জমীর উপর চুন বালি দিয়ে একটি rough cast (Trullissatio) তৈরী করতে হয়। শেষে তার উপর ছাঁকা চুন আর বালির (মার্ব্বেলের গুঁড়োও দেওয়া হ'ত) প্রলেপ দিতে হয়। চুনবালির প্রলেপ (Intonaco) দেবার সময় চুন ও বালিকে ভালকরে ছেঁকে খুব মিহি করে নিতে হয়। Cannino চুন ও বালি মেশানোর ভাগ সম্বন্ধে তাঁর প্রাচীন গ্রন্থে দুভাগ বালির সঙ্গে একভাগ চুন (Caustic lime) মেশাতে বলেছেন। জার্ম্মান-প্রণালী অনুসারে তিনভাগ বালি ও একভাগ চুন দেবারই প্রথা আছে। কখন বা জমী তৈরী হয়ে গেলে তার উপর মোম রজন আর তেলের একটি প্রলেপ দিয়ে তার উপর গরম করে তাতিয়ে ঘসে দর্পনের মত পালিস করা হ'ত। এইরূপ ভাবে গরম করে ঘসলে পালিসটা frescoeর ভিতরে প্রবেশ করত, সহজে নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকতনা। জমী তৈরী

হয়ে গেলে ক্রমাগত চুনের জল দিয়ে জমী ভিজিয়ে রেখে তাতে রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হ'ত। জমী তৈরী করে কিছুকাল ফেলে রেখে তার উপর ছবি আঁকা চলতনা। তাই ইটালীয় চিত্রকরেরা রোজ যতখানি ছবি এঁকে শেষ করতে পারতেন ঠিক ততখানি জমী তৈরী করতেন। ইটালীয় frescoeতে তাই শিল্পীদের এক একদিনের কাজ-শেষের জোড়ের দাগ এখনও নজর দিয়ে দেখলে ধরা যায়। Frescoe ভিজে থাকতে থাকতে আঁকার রীতিকেই Wet process বা Frescoe Buono বলা হয়। Frescoeর সমস্ত জমী চুনবালি দিয়ে যথারীতি তৈরী করে নিয়ে সেটাকে ভালকরে একবার শুকিয়ে তারপর চুনের জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে আঁকাকে Dry process বা Frescoe Secco বলে। Frescoe একেবারে শুকিয়ে গেলে তার উপর আঁকা চলে না এই হল ইউরোপীয় ভিত্তিচিত্রের বিশেষত্ব। মোগল আমোলের প্রচলিত পঙ্খের কাজ কিম্বা জয়পুরের Frescoeর সঙ্গে কতকটা মিল আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভিত্তিচিত্রে মাটি দিয়ে জমী তৈরী করা হ'ত বলে তাতে জল দিয়ে ভিজিয়ে আঁকা হ'ত না। ইউরোপের frescoeর কলারীতির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় কলারীতির এইখানেই গুরুতর প্রভেদ।

ইউরোপীয় ও ভারতের চিত্রে রঙের সঙ্গে ব্যবহৃত আটা

ইউরোপে প্রধানত তিন প্রকারের আটা দিয়ে রঙ তৈরী করা হ'ত। শিরিষের আটায় তৈরী রঙ—Size tempera, ডিমের হলুদ অংশ মিশ্রিত রঙ—Egg tempera, আর মোমের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে তৈরী Wax tempera ব্যবহার হ'ত। ভারতবর্ষীয় চিত্রে প্রধানত গঁদের আটা (বেল বা নিম প্রভৃতি গাছের আঠা) তেঁতুল বীজের

আটা ব্যবহার হ'ত। বাগের চিত্রগুলি যে কি আটা দিয়ে আঁকা হয়েছিল তা বলা যায় না। ৪নং গুহার বারান্দার যে স্থানে চিত্রগুলি আছে তার ছাদ একেবারে ধসে পড়ায় প্রায় হাজার বৎসরের উপর সেই সব চিত্রগুলি জল ঝড় রোদের মধ্যেও এখন পর্য্যন্ত টিঁকে আছে। Sir. W. Richmond ডিমের হলুদ অংশ দিয়ে আঁকা একটি চিত্র ছমাস ঘরের বাইরে ফেলে রেখে দেখেচেন যে ভিজেতে পড়ে থেকেও ছবির কোনো ক্ষতি হয়নি।* বাগের চিত্রেরও এইরূপ অসাধারণ স্থায়ীত্ব দেখলে ডিমের আটা দিয়ে আঁকা হয়েছিল বলেই অনুমান হয়। উড়িষ্যার ও বাঙলাদেশের পটুয়াদের কাছে আমরা শুনেচি যে, তেঁতুল বীজের তৈরী আটা দিয়ে আঁকা ছবি যত পুরাতন হয় তত মজবুত ও স্থায়ী হয়। এইসব পটুয়ারা ৩।৪ শত বৎসর থেকে বংশানুক্রমে চিত্রকলার কাজ করে আসচে এবং তাদের পূর্ব্বপুরুষদের আঁকা পাটার চিত্রগুলি তাদের কথার সাক্ষ্য দিচ্চে।

ভারতে ও ভারতের বাইরে ভিত্তিচিত্রের রঙের কথা।

ভিত্তিচিত্রে কোনো দেশেই জীবজ (animal) বা উদ্ভিজ্জ (vegitable) রঙ কখন ব্যবহার হ'ত না। পাথর, খনিজ বা' মেটে রঙই কেবল মাত্র ব্যবহার হ'ত বলে জানাযায়। বাগের বা অজন্তা প্রভৃতির ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ভিত্তিচিত্রে এলামাটি, খড়ি মাটি, দুতিন প্রকারের গেরীমাটি সবুজমাটি বা সবুজ পাথর, (Terra Verte) কালো, ধূসর বা অপর নানা বর্ণের মাটি, নীল পাথর (Lapis lazuli) † (লাজবর্ত্ত) থেকে তৈরী নীল রঙই অধি-

---

* Encyclopedia Britanicaর Painting. অংশ দ্রষ্টব্য।

† The History of Fine art in India and Ceylon., Page, 279.

কাংশ ব্যবহার হতো দেখা যায়। বাগের চিত্রে আমরা লাক্ষা বা আলতার (Crimson) লাল রঙের ব্যবহার কোথাও কোথাও দেখেচি। সিংহল দ্বীপের প্রাচীন চিত্রে নীল রঙের ব্যবহার দেখা যায় না, হলদে রঙও খুব কম আছে। কতকগুলি রঙ নানান রঙের সংমিশ্রণে তৈরী হ'ত।

বাগের চিত্রের মূর্ত্তি বিন্যাস বা ঠাট (Composition)

বাগের চিত্রের-মূর্ত্তি সংস্থাপনে বা ঠাটে (Composition) অজন্তার চিত্রের অনুরূপ ঘেঁসা ঘেঁসি ভাবে অনেক বস্তুর একত্র সমাবেশ করলেও খুবই চিত্তাকর্ষক। বাগের নাচের চিত্রের মূর্ত্তি-সংস্থাপন কতকটা চক্রবৎ (Circular composition)। নর্ত্তকীদের মাথাগুলি একটি অপরটির বিপরীত দিকে হেলে পড়ায় নাচের হিন্দোলটি ভারি চমৎকার ফুটেচে! ঘোড়া হাতীর মিছিলের ছবি খুব বেশী মাত্রায় ঘেঁসাঘেঁসি করে আঁকা হয়েচে বলে মিছিলের গুরুত্ব বা ভীড়টা খুব বেশী বোঝা যাচ্চে। একস্থানে মিছিলের ছবিতে একটি মাহুত হাতী চালাতে চালাতে হাতীর মাথার উপর কাৎ হয়ে দুটি হাতের উপর মাথা রেখে দিব্যি শুয়ে আরাম করচে! আসলে সেখানে হাতীটি ছাদের নীচে দেয়ালের শেষে এমন জায়গায় আঁকা আছে যে তার উপর মাহুতকে সোজাভাবে বসে আছে আঁকলে তার মাথা একেবারে বাদ পড়ে যেতো। এই দোষটিকে এমন সহজ ভাবে মাহুতকে হাতীর মাথার উপর শুয়ে বিশ্রাম করার ভাবে এঁকে সুধরে নেওয়া হয়েচে যে, সহসা ছবিটি দেখলে সেকথা মনেই হয় না। চিত্রের ঠাট রচনায় (Compositionএ) যে ছন্দ নিহিত আছে বাগগুহার চিত্রকরেরা যে বিশেষভাবে তা জানতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাগচিত্রে বিশেষ ধরণ (Style)

বাগের ৪নং গুহার বারান্দায় যে সব ছবি এখন আছে দেখা যায় সেগুলি দুটি বিশেষ ধরণে (Styleএ) আঁকা। তাছাড়া এই গুহারই অভ্যন্তরের চিত্র-গুলি এবং ৩নং গুহার চিত্রগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরণের আঁকা। ৪নং গুহার বারান্দার এক অংশের চিত্রগুলি দেখলে কোনো একদল ওস্তাদ শিল্পীদের হাতের কাজ বলে মনে হয়। বারান্দার অপর চিত্রগুলি ঠিক্ সে হাতের কাজ বলে মনে হয় না। অজন্তার চিত্রে ও প্রত্যেক গুহায় বিভিন্ন হাতের কাজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম। *

রেখাঙ্কন ও ছায়া আলো সমাবেশ

বাগগুহার রঙমহলের (৪নং গুহার) বারান্দার যে অংশের ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে সেগুলি যে খুব উচুদরের চিত্র তা তার বর্ণ বিন্যাসে ও আঁকার ধরণ (Style) দেখলেই সহজে বোঝা যায়। অজন্তার কোনো কোনো চিত্রে যেমন রেখার টানের বিশেষত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেচে বাগের এই চিত্রগুলিতে তেমন রেখাঙ্কন কৌশলের বিশেষত্ব নেই। এ চিত্রগুলি আলোছায়ার সমাবেশে (Light & shade)ও এমন বিরুদ্ধ-বর্ণবিন্যাসে (Colour contrast) আঁকা যে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের কোনো বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রকলার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বাগের চিত্রগুলি আঁকার সমসাময়িক যুগে ইউরোপে বা পৃথিবীর কোথাও কলাকৌশলের (Technique) এতদূর উন্নতি হয়েছিল বলে জানা যায় না। হাতীর শুঁড়ের খাঁজ এবং তার গলার নীচের নরম অংশগুলি এমন নিপুনভাবে বুঁদিয়া কলমে (অর্থাৎ Stipple দিয়ে) আঁকা যে অত প্রাচীন কালের ছবি

* লেখক প্রণীত "অজন্তা" দ্রষ্টব্য।

বলে মনেই হয় না। ঘোড়ার পায়ের, ও মুখের ধারে এমন মোলায়েম Shading দিয়ে আঁকা আছে যে সেগুলি ইটালীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক রেমব্রাণ্টের চিত্রের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা হয়। এক কথায় কলারীতির (Technique এর) যা কিছু এখন আধুনিক কালে শিল্পীরা আবিষ্কার করেচেন তা তখনকার কালে ভারত-বর্ষীয় চিত্রশিল্পীরা যে অবগত ছিলেন তাদের কাজ ভাল করে দেখ-লেই তা বোঝা যায়। ৪নং গুহার ভিতরে যে আলঙ্কারিক চিত্র আছে সেটিতে রেখার টানের নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাগের ছবির বর্ণনা

বাগে ৯টি গুহা এখন দেখা যায়। তারমধ্যে ৪নং গুহা ও ৩নং গুহায় চিত্রের (Frescoeর) ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অপর ২।১টি গুহার দেয়ালের গায়ে ছবির জমী তৈরী পলস্তারা ও থামের গায়ে রঙের চিহ্ন কচিৎ দেখা যায়। ২নং গুহার হলের মধ্যে ও ধারে ছাদের নীচে (ceilingএ) কারুচিত্রের মত পদ্মমণ্ডল চিত্রিত আছে। এখন সেখানে গুহাটিতে সন্ন্যাসীরা বাস করায় তাঁদের ধূনীর ধোঁয়ায় একেবারে কালো হয়ে গেছে। ৩নং গুহায় হলের পাশে বারান্দার ছাদের নীচে আলঙ্কারিক চিত্র (decorative design) কিছু আছে। তাছাড়া একটি মেয়ে একপাশে দরজার দিকে হেঁট হয়ে চামর ব্যজন করচে, আর একপাশে একটি মেয়ের মুখটুকুমাত্র আঁকা আছে দেখা যায়। ঘরটির মধ্যে চারধারে জ্যোতির্মণ্ডল ও ছত্রযুক্ত পদ্মাসনে দাঁড়ান বুদ্ধের চিত্র ছিল; এখন বুদ্ধের মূর্ত্তিগুলির কেবলমাত্র পায়ের অংশ বা মাথার ছত্রের অংশটুকুই দেখা যায়।—বাকি অংশ সব ঝরে পড়ে গেছে। একটি বুদ্ধের মূর্ত্তির পাশে ধুপুচিধারী কোনো এক ভক্তের মূর্ত্তি

আঁকা আছে। প্রকোষ্ঠটির ঠিক মাঝখানের দেয়ালে একটি জ্যোতির্মণ্ডল পরিবেষ্টিত বিরাট দাঁড়ান বুদ্ধমূর্ত্তি আঁকা ছিল, তার দুপাশে হাতীর উপর সিংহ আঁকা আছে। সম্ভবত এইরূপে একটি সিংহাসন আঁকা হয়েছিল, এবং এই মূর্ত্তিটির তখন পূজা হ'ত। ৩নং গুহার এই বাসগৃহের পাশের কয়েকটি কামরায় ছবি আঁকার জন্যে জমী তৈরী করা ছিল কিন্তু এখন তাতে উল্লেখ যোগ্য চিত্র কিছুই নেই।

রঙমহলের (৪নং গুহার) প্রবেশপথের সামনে সারে সারে ৭লাইনে ৫টিকরে মোট ৩৫টি ছোট ছোট (আন্দাজ ৫ইঞ্চি প্রমাণ) ধ্যানী বুদ্ধের ছবি আঁকা আছে। মূর্ত্তিগুলি পদ্মের পাপড়ির মত জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝে কতকটা বাঙলাদেশের প্রতিমার মত করে আঁকা আছে। এছবিগুলি কোনো ভক্ত-শিল্পীর তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্যে প্রতিদিন এক একটি করে আঁকা। এখনও এইরূপভাবে ভক্ত-শিল্পীরা ইষ্টদেবতার চিত্র জাপানে, চীনে, তিব্বতে এঁকে থাকেন। এ ছবিগুলি একহাতেরই কাজ বলে মনে হয়। রঙমহলের মধ্যে হলের চারপাশে প্রায় ৬ফুট চওড়া একটি মণ্ডনচিত্র (decorative design) আঁকা আছে; সেটি সাদা সবুজ হলুদ ও কালো রঙ দিয়েই প্রধানত আঁকা। হলের ভিতর প্রত্যেক থামের উপরে একটি করে মূর্ত্তি আঁকা আছে। সেগুলিকে দেখলে মনে হয় নৌকোর উপরে বসে আছে। আবার সেই নৌকোর দুপাশে উচু অংশ দুটি হাতের মত দেখায়; তাতে মূর্ত্তিগুলিকে চতুর্ভুজ বলে মনে হয়। সেগুলি সাদা ও কালো রঙ দিয়েই আঁকা এখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ছাদের নীচে ফল ফুলের নানা রকমের আলঙ্কারিকচিত্র এক একটি Panelএ ভাগ করে আঁকা আছে। ছাদ এখন প্রায় সমস্তটা ভেঙে পড়ে

গেছে। এক সময় খুব সম্ভব এই গুহার ছাদ মণ্ডনচিত্রে পরিশোভিত ছিল। গুহার ভিতরকার এই সকল চিত্রে রঙের চেয়ে রেখার টানের দক্ষতাই বেশী ফুটেচে। রঙমহলের বারান্দার ডানদিকের প্রথম দরজার উপরে ছবিতে একটি পাঁচিল ঘেরা স্থানে একটি লোক একপা ছড়িয়ে একপা গুটিয়ে হাঁটুর উপর দুটি হাত রেখে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে এরূপ আঁকা আছে। তার ধারে একটি কলাবাগানে একটি মেয়ে পিছন ফিরে তার একটি হাত কোমরে একটি হাত গালে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তারই ঠিক উপরে একটি লোক শুয়ে আছে। একটি অদ্ভুতদর্শন লোকের মুখের খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্চে। তার পাশে দরজার ধারে দেয়ালে হলুদ ও লাল গোল গোল ভাবে আঁকা পাহাড় ও তার উপরে একটি উদ্যান আঁকা আছে। উদ্যানে দুটি তিনটি লোক আঁকা আছে। পাহাড়টির নীচে কয়েকটি মেয়ের মুখগুলি মাত্র আছে, বাকি অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ধারে আর একটি পাঁচিল। এই পাঁচিলের ধারে উপরের দিকে একটি জামা পরা (সাধারণ লোক বলেই মনে হয়) লোক একটি উচু যায়গায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েচে। তার পাশে একটি সন্ন্যাসীর মত লোক হাতের উপর হাত রেখে চৌকির উপর বসে আছেন। এই ছবিটিতে ভারি চমৎকার গাম্ভীর্য্য ও ভক্তির ভাব ফুটে উঠেচে। তারই পায়ের কাছে একটি বামন ভৃত্য বসে আছে। তার পরের দরজার উপর একটি কালো মেয়ে ডুরে ছিটের গদীর মত আসনে বসে আছে, তার সামনে একটি লোক কাঠের আসনে বসে যেন কি গুরুতর বিষয় আলোচনা করচে। কালো মেয়েটির কালো রঙের বাহার যে কত ফুটেচে তা বর্ণনা করা যায় না!

কালো রঙের মধ্যে কত বাহার থাকতে পারে তা এই মেয়ের গায়ের রঙ দেখলেই বোঝা যায়। দরজার অপর পাশের দেয়ালের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গাছের উপর থেকে যেন কি চয়ন করচে। তার পাশে একটি মেয়ের মুখ ও হাতের অংশ মাত্র আছে। এই চিত্রের উপরের দিকে কতকটা স্থান আকাশ ও নিচের দিকে পর্ব্বত আঁকা। ইটের পাঁজার মত ক'রে সাজান অজন্তাতে যেরূপ পাহাড় আঁকা আছে এটিতেও অবিকল সেইরূপ। পাহাড়ের উপর দুতিনটি হনুমান আঁকা আছে দেখা যায়। দুটি দরজার ঠিক মাঝখানে উল্লিখিত চিত্রগুলির ভিতর একটি বিরাট রাজ-মুকুটধারী দেবদ্বারীর মূর্ত্তি আঁকা আছে। অজন্তার গর্ভগৃহের দুপাশের দেয়ালে যে দুটি দেবদ্বারীর চিত্র আছে এই মূর্ত্তিটি ঠিক সেই ধরণেই আঁকা ছিল বলে বোঝা যায়। অজন্তার এইরূপ দেবদ্বারীর মূর্ত্তিকে বোধিসত্ত্বের বা বুদ্ধের গৃহত্যাগের ছবি বলে সকলে অনুমান করেচেন। বাগের এই মূর্ত্তিটিকে জল দিয়ে ভেজালে সম্পূর্ণরূপে দেখা না গেলেও আংশিক ভাবে যা দেখা যায় তাতে ছবিটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না। দেবদ্বারীর মূর্ত্তিটি অজন্তার দেবদ্বারীদ্বয়ের মতই মানুষের প্রায় দ্বিগুণ বড়। মূর্ত্তিটির পাশেই একটি ধ্যানী রাজমূর্ত্তি। তার ধারে দুটি ময়ূর মেঘের মাঝে পাহাড়ের উপর বসে আছে। দেবদ্বারীর মাথার উপর পাখীর পায়ের মত পা কয়েকটি কিন্নরী (অজন্তায় ও ঠিক এইরূপ আছে) একপ্রকার সেতারের মত বাদ্য যন্ত্র বাজাচ্চে। স্বর্গের দেবতা ও কিন্নর কিন্নরীরা এই গুহা রক্ষা করচেন এইরূপ ভাবে আঁকা ছিল মনে হয়। উল্লি-

* A Handbook of Indian Art by E. B, Havell., Page. 200.

খিত চিত্রগুলি জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে একমাস ধরে বাগের অপর চিত্রগুলি দেখে কতকটা অভ্যস্থ হয়ে যাবার পর আমরা দেখতে পেয়েছিলুম। বাগের চিত্রগুলি যে সহজে ভালরূপে দেখতে পাওয়া যায় না তা আমারই লেখা ১৩২৪ সালের প্রবাসীতে "বাগগুহা" প্রবন্ধ দেখলেই জানা যাবে। সে সময় আমি সচক্ষে চিত্রগুলি দেখেও সঠিক বিবরণ কিছুই দিতে পারিনি। রঙমহলের বারান্দার ঠিক মাঝামাঝি দেয়ালে পাথর চাপা পড়ায় চিত্র একেবারে লোপ পেয়েছে।

৪নং গুহার (রঙমহলের) ও ৫নং গুহার দ্বারের ব্যবধানের মধ্যে বারান্দার অংশে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা ও ৭ ফুট চওড়া চিত্র এখনও আছে। এই ছবিগুলির অঙ্কনপদ্ধতি ও ঘটনা-পর্য্যায় এমন পরস্পর সংলগ্নভাবে আঁকা যে দেখলেই সমস্ত ছবিগুলি যে একটা কোনো ঘটনা বিবৃত করচে সে বিষয় কোনো সন্দেহই থাকে না। আমরা বৌদ্ধ জাতকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেচি কোন গল্পের সঙ্গে হুবহু মিল নেই আংশিক ভাবে মিল থাকতে পারে। তাতে মনে হয় সম্ভবত তখনকার কালের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেই চিত্রগুলি আঁকা হয়ে থাকবে। চিত্রের অধিকাংশই আমরা নকল করতে পেরেছিলুম। তার প্রথম দৃশ্যে একটি রাণী ও পরিচারিকার শোকের দৃশ্য। তারপরে দুজন রাজ-পুরুষের সঙ্গে আগন্তুকের সংবাদ। তার পরবর্ত্তী চিত্রে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা উড়ে চলেচেন তারপরে দুটি চিত্রে দুজন পারস্য বেশধারী লোককে ঘিরে নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত। তারপরের দৃশ্যে হাতী ঘোড়ায় চড়া রাজা ও সৈনিকদের মিছিল। আর সব শেষে একজন সন্ন্যাসী-বেশী লোক উদ্যানে অশোক গাছের নিচে বসে আছে এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে আঁকা (panorama)

আছে। বিস্তারিত বিবরণ "গুহার কথা" প্রসঙ্গে লেখা হ'ল বলে পুনরুল্লেখ করা হ'ল না।

মহাবংশ গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে বাগচিত্রের আংশিক মিল

সিংহলের প্রাচীন গ্রন্থ মহাবংশ যদিও বেশীর ভাগ অলৌকিক উপকথায় ভরা আছে তবুও তার ভিতর প্রাচীন বৌদ্ধযুগের চালচলন ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা ছাপ থেকে গেছে সে বিষয় সন্দেহ নেই। মহাবংশে ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের যেসব আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে গুলির সঙ্গে অজন্তা বাগ প্রভৃতির চিত্রের অনেক যায়গায় মেলে। উৎসবের সময় বৌদ্ধরাজারা যখন মহাসমারোহে নগরপথে হাতী ঘোড়া বা রথে চড়ে লোক লস্কর দের সঙ্গে শোভাযাত্রা করতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে (কখন কখন তাঁদের পরিবেষ্টিত করে) নানা সজ্জায় বিভূষিতা নর্ত্তকীরা নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র নিয়ে থাকত। নর্ত্তকীদের মাথায় বহুমূল্য শিরোভূষণ পরা থাকত। বাগও অজন্তায় নর্ত্তকীদের এরূপ বহুমূল্য শিরোভূষণ আঁকা আছে দেখা যায়। বাগের চিত্রে রাজন্য-বর্গের শোভাযাত্রার মধ্যে যে ঢোলক কাঁধে ঝোলান মেয়েরা নানান আভরণ পরে হাতীর পিঠে চড়ে যাচ্ছে আঁকা আছে তার সঙ্গে মহাবংশের বর্ণনা খুব মেলে। বাগের চিত্রে কতকগুলি সাধু আকাশের কোলে মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আঁকা আছে। মহাবংশ পাঠে জানা যায় বৌদ্ধ অর্হতেরা অতি-মানুষী ক্ষমতা দেখাবার জন্যে এইরূপ আকাশ পথে ইচ্ছা করলেই বিচরণ করতে পারতেন। বাগের চিত্রে একটি উদ্যান-তলে সাধুর যে ছবি আঁকা আছে সেটি দেখলে মহাবংশের উল্লিখিত রাজাদের তৈরী আরাম (Park) এ কোনো রাজগুরু অর্হতের ছবি বলেই মনে হয়। নাচগানের ছবির ভিতর

যে দুটি পারস্য বেশধারী লোকের চিত্র আছে সেদুটিকে দেখলে মনে হয় যেন তারা পরচুল (wig) পরে আছে আর তাদের নাচের ভাব নর্ত্তকীদের মত মৃদু হিল্লোলে চল্‌চেনা—একেবারে থাপ ছাড়া উল্লাস নৃত্য! (কতকটা কাবুলি নাচের মত।) মহাবংশে রাজাদের উৎসবে এইরূপ সঙের নাচের (Mimic dance এর)* বিষয় উল্লেখ আছে দেখতে পাওয়া যায়। বাগের ছবিতে মিছিলের লোকেদের মাথার পিছনের চুলটা খোঁপার মত বাঁধা, তার উপর নানাবিধ ছিটের কাপড় জড়ানো আঁকা আছে। এরূপ খোঁপা বাঁধা পুরুষের ছবি বা মূর্ত্তি বাগের অপর চিত্রগুলিতে বা অপর কোথাও দেখিনি। সাঁচীর রেলিংএ যে মাথায় কাপড় জড়ানো ঝুঁটিবাঁধা মানুষের মূর্ত্তি আছে এগুলি ঠিক সেরূপ নয়। সাঁচীর মূর্ত্তিগুলির ঝুঁটি মাথার উপর দিকে শিখেদের বেণীর মত কাপড় জড়িয়ে বাঁধা। মহাবংশে স্তূপ নির্ম্মানের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্তূপের চিত্র আঁকার জন্যে পলস্তারা "শুদ্ধকাম" (Sudhakama) ও সোনার রূপার রঙের কাজের (Kankutthaka) ও একপ্রকার মণ্ডলচিত্রের (Pancangulikapantika) উল্লেখ আছে। *

বাগচিত্রে জীবজন্তু ও আসবার পত্রের চিত্র

আমরা বাগের মিছিলের চিত্রে আঁকা ঘোড়ার মত অত নিখুঁৎ তেজী ঘোড়া অজন্তার চিত্রের মধ্যেও পাইনি। ঘোড়ার ভঙ্গি ও চোখ মুখের ভাব দেখলে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের Landseerএর চিত্রের কথা মনে পড়ে। অজন্তার মত বাগের হাতীর চিত্র খুব জোরালো ভাবে আঁকা। পাখীর মধ্যে ছাদের নীচের কাক-

* Geiger's Mahavamsa., Page. 242.

* Geiger's Mahavamsa Page., 220.

র্ধ্যার সঙ্গে হাঁসের চিত্র আছে। তাছাড়া নীল গোলা পায়রা
য়ূর খুব চমৎকারভাবে আঁকা আছে। ময়ূরের চিত্রটি এখন
হয়ে গেছে। গোলাপায়রার রঙ ফলানো দেখে আশ্চর্য্য হ'তে
। এই গুহাতে এই জাতির পায়রা অসংখ্য বাস করে।

আসবাবপত্রের মধ্যে ঘোড়ার সাজ, ধনুক, তরবারীর কাজ করা
খাপ, হাতীর পিঠের ডুরে ও মুক্তার ঝালর দেওয়া হাওদা ও চাদর,
নানা প্রকারের ছিটের জামা, নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র আঁকা
আছে। অজন্তায়ও ছিটের জামা অনেকস্থলে পরান আছে।
এখানে আঁকা এক প্রকারের জামার ছিট হুবহু অজন্তার আঁকা
একটি জামার ছিটের সঙ্গে মেলে। মেয়েদের মাথার ফুলের
গয়না, নানা প্রকার বলয় ও চুড়ি, গলায় নিখুঁৎ গোল গোল মুক্তার
কণ্ঠিহার (মাঝখানে নীল পাথর দেওয়া) আঁকা আছে। রাজার
মাথার মুকুটে নানা প্রকারের কাজকরা মুক্তার ঝালর দেওয়া।
গলায় অজন্তার চিত্রের রাজাদের মত কণ্ঠিহার ও মুক্তার উপবীতের
মত গহনা আছে। রাজাদের বসবার আসনও তাকিয়াগুলি ঠিক
অজন্তার চিত্রে আঁকা তাকিয়া ও আসনের সঙ্গে মেলে।

এ পর্য্যন্ত বাগের বিষয় যত বিবরণ লেখা হয়েছে তাতে জানা যায়

বাগের চিত্রে প্রাচীন লিপি

যে বাগের চিত্রে বা পাথরের দেয়ালের গায়ে কোনো প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় না। চিত্রের
নকল নেবার সময় আমরা ছবির মধ্যে দুজায়গায় লাল রঙ দিয়ে লেখা
প্রাচীন লিপির ভগ্নাবশেষ পেয়েচি। আমরা একটি লিপির নকল করতে
পারিনি কেন না সে লিপিটি চোখে দেখা গেলেও এমন অস্পষ্ট যে
নকল করা যায় না। অপর একটি লিপির দুটি লাইনের মধ্যে ভাঙা
অক্ষরের অংশগুলি এবং শেষের দুটি অক্ষর আমরা নকল করতে

পেয়েছিলুম। গোয়ালিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গার্দ্দে মহাশয়কে আমরা লিপিগুলি দেখিয়েছিলুম কিন্তু তিনি পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। সম্প্রতি আমরা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে লিপিটির একটি নকল পাঠিয়েছিলুম। তিনি দুটি লাইনের শেষের দুটি অক্ষর, যেটুকু অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আছে আর তার পাশের কয়েকটি অক্ষরের ভাঙা অংশ দেখে, প্রথম ছত্রের শেষে "সিক" এবং দ্বিতীয় ছত্রের শেষে "হরিদে" লিখিত ছিল বলেন। তিনি অনুমান করেন যে প্রথম ছত্রের শেষের শব্দটি "উপাসিক" (Buddhist lay-worshipper) এবং দ্বিতীয় ছত্রের শেষ শব্দটি "হরিদেব" লিখিত ছিল। অক্ষরগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলে অনুমান করেন। রাখাল বাবুর উল্লিখিত লিপিপাঠ থেকে এটুকু জানা যাচ্চে যে অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে হরিদেব নামে কোনো উপাসিক সে সময় এই চিত্রগুলি এঁকে-ছিলেন কিম্বা তিনি চিত্রকরদের দ্বারা গুহাটিকে পরিশোভিত করে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন।

শেষ কথা

বাগের চিত্র যাঁরা পূর্ব্বে দেখেছিলেন তাঁদের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে তাঁরা চিত্রগুলির নকল নেওয়া সম্ভব মনে করেন নি। জল দিয়ে ক্রমাগত ভিজিয়ে ছবিগুলি কিছুকাল ধরে দেখতে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেলে তবে চোখে পড়ে, সহজে কিছুই দেখা যায় না। স্থানীয় লোকেরা বুঝতে না পেরে "পাঁচপাণ্ডুর" (?) তীর্থে নিজেদের নাম ধাম ছবির উপরে লিখে পুণ্য সঞ্চয় করে; এবং সময় সময় ছবির রঙ দেয়াল থেকে চেঁচে নিয়ে যায়। আমরা বাগের ছবির একটা ভাঙা অংশে ভাতের মাড় (Starch) লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি

তাতে ছবি বেশ স্থায়ীভাবে ফুটে ওঠে এবং বার্নিশের মত ছবির রঙের কোনো ক্ষতি করে না। এ বিষয় আরো পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেশ স্বাধীন ও সভ্য হলেই সাধারণত দেশের দশের কাছে আর্টের কদর হ'তে দেখা যায়। আমাদের দেশের এই সব গুহাগুলির দুর্দ্দশা দেখলে বোঝা যায় যে বৌদ্ধযুগে এদেশ স্বাধীনতার ও সভ্যতার শীর্ষস্থানে পৌছনর ফলেই এমন সব চিত্রকলা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তার পরবর্ত্তী যুগে পুনরায় পদানত ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশ ডুবে যাওয়ায় দেশের আর্ট হাজার বৎসর ধরে লোক চক্ষুর অন্তরালে গুহার মধ্যে ধ্বংশ পেতে পেরেছিল। তার খোঁজ পর্য্যন্ত কেহ নেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। পুনরায় ধীরে ধীরে এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোক দেশের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করায় গুহার মধ্যেও তার রশ্মিচ্ছটা গিয়ে পড়ল, তাই আমরা তার এত গৌরবের কিছু চিহ্ন আজ স্থানে স্থানে দেখতে পাচ্চি ও নিজেদের ধন্য জ্ঞান করচি!

রামগড়

পথের কথা

১৯১৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমার এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ গুপ্তের সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে ডাক পড়ল—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হ'য়ে আমাদের মধ্য-ভারতে সুরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড়গিরিগুহায় ছাদের নীচের খৃঃ পূঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি নিতে যেতে হ'বে। ভারতবর্ষের চিত্রকলার এর চেয়ে প্রাচীন নিদর্শন এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আমরা উভয়ে যথাসময়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনে উপস্থিত হলুম। এই পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনটিতেই অমরকণ্টক তীর্থযাত্রীদের নাম্‌তে হয়।

যথাকালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আমাদের সহযাত্রী মিষ্টার ব্ল্যাকিষ্টনের করমর্দ্দন ক'রে করী পৃষ্ঠে আরোহণ করলুম। আমাদের সঙ্গে ছিল ৬০ জন কুলি। তারা তাঁবু, খাবার জিনিষপত্র, বাক্স, সিন্দুক নেবার জন্য নিযুক্ত ছিল, আর আমাদের বহন করবার জন্যে ছিল দুটো হাতী। প্রথম দিনের যাত্রাটি আমাদের অবশ্য খুবই উৎসাহে এবং আমোদে কেটেছিল, কিন্তু যখন শুন্‌লুম ৬ দিনের যাত্রা শেষ করে ৭ দিনের দিন আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব; তখন উৎসাহের বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল। কেননা, মধ্যভারতের দিবা-দ্বিপ্রহরের উত্তাপ এবং তার উপর ক্রমাগত প্রায় অনশনে পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করার

কষ্ট প্রথম দিনেই আমরা যথেষ্ট অনুভব করেছিলুম। রামগড় পাহাড় ষ্টেশন থেকে একশত মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা বিকেল তিনটার সময় শেষ হ'ল। আমাদের ক্রমাগত পর্ব্বত অতিক্রম করার জন্যে ওঠানাবায় যাত্রার গতি অত্যন্ত মৃদু হ'য়ে পড়ছিল। আমরা আমাদের বিশ্রামের চটী যেখানে পেলুম সেখানে গ্রামের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। একটি বেশ ছায়া-স্নিগ্ধ স্থানে আমাদের শিবির-নিবাস স্থাপিত হল। আমরা সেখানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ মত রাজ-সরকারের অধীনস্থ স্থানীয় চৌকিদার এবং গ্রামের মোড়লেরা (খোর-পোষ দারেরা) আমাদের শিবির স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করে গোবর জল দিয়ে 'নিকিয়ে' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উনুন তৈরী করে জল কাঠ প্রভৃতির সরবরাহ করে আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ রেখেছিল; এমন কি চাল ডাল ঘি ময়দার সিধাও প্রস্তুত ছিল। তরকারীর মধ্যে শিম ছাড়া ওখানে অন্য কোন তরকারীই আমরা চোখে দেখিনি। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে শিমগাছ আছেই আছে। শুনলুম আমাদের পথে পথে যত চটী হ'বে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা এই রকম ব্যবস্থাই ঠিক রাখবে। আমরা সকল স্থানেই এই রকম আয়োজন প্রস্তুত পেয়েছিলুম। কোন কোন স্থানে পাতার ছাওয়া ঘরও তৈরী করে দিয়েছিল। বাল্মীকি রামের বন-বাসের উল্লেখকালে তাঁদের পর্ণকুটীরের যে বর্ণনা করেছেন আমা-দের সেই পাতার ঘরে বাসের সময় সেই অরণ্যবাসের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়ছিল!

পথে বিশ্রামস্থানে এক জায়গায় আমাদের তাঁবুর কাছেই একটি স্বাভাবিক জলাশয় অর্থাৎ বাঁধ ছিল। তারই নিকটে একটি বৃহৎ

অশ্বথ গাছ একখণ্ড প্রকাণ্ড বড় পাথরের উপর এমন ভাবে জন্মেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সেটা যেন পথিকদের বিশ্রামের জন্যে পাথর দিয়ে লোকেরা বাঁধিয়ে রেখেচে। এই স্থানটীতে আমাদের বিশ্রাম করে এতই আরাম বোধ হয়েছিল যে সমস্ত পথের ক্লেশ যেন কোথায় অবসান হয়ে গেল। সে রাত্তিরটা যে কখন কেটে গেল আমরা কিছুই অনুভব করতে পারলুম না।

সমস্ত তাঁবু গুটিয়ে জিনিষপত্র বেঁধে সেগুলি কুলিদের দিয়ে সর্ব্বাগ্রে চালান করে দ্বিতীয় দিনের যাত্রা আরম্ভ করলুম। ক্রমে এইবার আমরা বৃক্ষ-বিরল অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ গহনবনের মাঝে এসে পড়লুম। আর যত সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধি হ'তে লাগল ততই কুঞ্জরপুঙ্গব তাঁর উদর ভাণ্ডারের সঞ্চিত জল শুঁড় দিয়ে মুখগহ্বর থেকে বার করে পিঠের যে দিকটা তপনতাপে দগ্ধ হচ্ছিল সেই দিক্‌টা বারবার ভিজিয়ে স্নিগ্ধ করতে লাগলেন। তাতে আরোহীরা ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল! অগত্যা আমরা স্থানে স্থানে পদব্রজেই অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

সেই পার্ব্বত্য আরণ্য পথে যে কত লতাপাতা ফুল ফল কত পাখীর কাকলি-কূজন প্রভৃতি আমাদের চিত্তকে আনন্দরসে অভি-ষিক্ত করেছিল তা লেখাই বাহুল্য। আমরা গ্রামহীন "ক্রমর্গা" থেকে যথাসময়ে সেক্‌ড়া নামক গ্রামে এসে পৌঁছলুম। এখানে আমরা তাঁবুর হাঙ্গামা থেকে অব্যাহতি পেলুম। একটি সরাই আমাদের সেখানে পৌঁছবার অল্পদিন পূর্ব্বেই কোনো রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে তৈরী হয়েছিল, আমরা সেইখানেই ঠাঁই পেলুম। এই স্থানটি একটি উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এই কুটিরটিতে বাস করে জানা গেল যে এখানকার লোকে দড়ি প্রস্তুত করতে জানে

না। এখানে গাছের ছাল বা বাঁশের ছিলে দিয়েই দড়ির কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। "সেকড়া" গ্রামটির যে বিশেষত্বটি আছে তা ভোলবার নয়।—সেটা হচ্ছে, জলকষ্ট! এখানে একটি মাত্র কূপ আছে এবং তার জল এত অল্প যে দু-এক ঘড়া উঠালেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পুনরায় দুতিন ঘণ্টাকাল অপেক্ষা না করলে আর এক ঘড়া পাওয়া যায় না। এই কারণেই বোধ হয় এই গ্রামটিতে লোকালয়ের সংখ্যা মাত্র চার পাঁচটি।

পুনরায় প্রাতে আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় অরণ্যের পর অরণ্য নদের পর নদ পার হ'য়ে একটি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রামে এসে পড়্লুম। এই গ্রামটির নাম "পোরী"। গ্রামের এক প্রান্তে আম্র-কাননে আমাদের তাঁবু লাগ্ল। এখানে আমরা একজন শিশুর ন্যায় সরল হাসিখুসীমাখা সদাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ খোর-পোষ দারকে পেয়েছিলুম। তিনি আমাদের আশাতীত আপ্যায়িত করেছিলেন। এমন কি তিনি অসঙ্কোচে তাঁর বৃদ্ধার নিষেধসত্ত্বেও তাঁর একমাত্র শিম গাছ থেকে শিমকুল নির্ম্মূল করে আমাদের সেবায় লাগাতে কিছুমাত্র পশ্চাপদ হননি। এখানে সহসা একদল অভাবনীয় নটী ও নটের আমদানীতে আমাদের অত্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুলেছিল! এরা বহুদূরদেশ থেকে পদব্রজে পর্য্যটন করে গ্রামে গ্রামে তাদের বিকট সুর, স্বর ও অঙ্গভঙ্গিমা দেখিয়ে নিরীহ লোকেদের শ্রমলব্ধ অর্থের অনর্থসাধন করে বেড়াচ্চে। সৌভাগ্যের বিষয় সদাশয় ইংরাজ বন্ধুর কৃপায় আমাদের ঐ অনর্থে অর্থ ব্যয়িত হয়নি। তিনিই সে ভারটি গ্রহণ করে তাদের অর্থ দিয়ে বিদায় করেছিলেন। সেখানকার লোকেরা এতদূর নিরীহ যে গজপৃষ্ঠে মহাসমারোহে গ্রামের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে দেখে কে কোথায় যে পালিয়ে

লুকিয়ে পড়্‌বে সেই ভাবনায় অস্থির! এখানকার লোকেরা অধিকাংশই অসভ্যজাতীয়। এরা ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা ওরাওঁদের মতই অসভ্য। এদের কোরওয়া বলে। পূর্ব্বে সুরগুজারাজ্য, ছোটনাগপুরেরই এলাকাভুক্ত ছিল। কোরওয়াদের গ্রামের কুটিরগুলির একটা বৈচিত্র্য আছে। এরা ঘরদুয়ার একপ্রকার রঙিন মাটি দিয়ে ভারি চমৎকার চিত্রিত করে থাকে এবং এদের এমন কি দীনহীনের জীর্ণ কুঁড়েটিও অতি সযত্নে একটু আধটু স্থাপত্য-সজ্জায় সজ্জিত। এদের কুটিরের দাওয়ার কাঠের খুঁটির উপর মাটি দিয়ে এমন ভাবে থামের আকার তৈরী করেচে যে দেখ্‌লেই তাদের গৃহের শ্রী ও শান্তির কথা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে! প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের থামের আকার ও কারুনৈপুণ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিকল্পনায় গঠিত। এই সকল থাম প্রভৃতির গঠন প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শনের সঙ্গে বরং কিছু মেলে, আর এদের ভিতর ইউরোপীয় প্রভাব একেবারেই প্রবেশ করেনি। উঠানের চারপাশে রঙিন মাটি দিয়ে নানা রকম লতাপাতা এঁকেচে, আর মাঝখানে একটা সাদা মাটি দিয়ে লেপা বেদী। এখানে একপ্রকার সাদা মাটি পাওয়া যায়, অনেকটা চুনের মতই সাদা। চীনা বাসন প্রভৃতি ঐরূপ মাটিতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে।

আমাদের 'পোরী' গ্রাম ত্যাগ করে 'আমথা' নামক একটা পার্ব্বত্য বিস্তৃত ও ভীষণ অরণ্য পার হ'তে হ'ল। এই অরণ্যে শুন্‌লুম বন্যহস্তীর বাস। ছেলেবেলা যে "অজগর অরণ্যের" গল্প শুনেছিলুম এখানে সেটা প্রত্যক্ষ করলুম! বনটি স্থানে স্থানে এত নিবিড় যে সহসা সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করতে পায় না। আমরা ক্রমেই অরণ্যের গভীরতম প্রদেশ দিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। মধ্যে মধ্যে

সেই গহন অরণ্যে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটচে, তার শব্দ পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করচে; তার সঙ্গে বন্য কুক্কুট ও অন্যান্য পাখীরাও থেকে থেকে যোগ দিচ্চে। এই সমস্ত বনে হরিতকী আমলকী বয়ড়া প্রভৃতি গাছই প্রধানত দেখা যায়। আমাদের এবারকার চটীটি 'কাব্রাডোল' নামক একটি গ্রামের নিকটে অরণ্য, পর্ব্বত ও নদীর বেষ্টনের মাঝে অবস্থিত। এই স্থানে একটা তৃষ্ণাতুর চিতাবাঘ নদীর দিকে যাচ্ছিল দূর থেকে দেখেছিলুম কিন্তু এই স্থানটির অরণ্যাতিশয্যের মধ্যে সে যে সহসা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে পড়ল তা আর দেখা গেল না। এখানে একস্থানে কতকগুলি লোককে ঝড়েভাঙ্গা একটা গাছের গুঁড়ির মধ্য থেকে হেঁট হয়ে জল পান করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম; পরে শুনলুম ইটের পাড়ের বদলে ঐরকম গাছের গুঁড়ির এরা কূপের বেড়া দেয়।

এইবারে আমরা কোর‍্যা রাজ্যের হাতী এবং লোকেদের ত্যাগ করে সুরগুজা রাজ্যের একটি হাতী তিনটে ডুলি এবং ৬০ জন কুলির তত্ত্বাবধানে এসে পড়লুম। পরদিন আমরা পর্ণকুটিরের আবাস ত্যাগ করে তাঁবু গুটিয়ে সুরগুজা রাজ্যের দিকে রওনা হলুম।

আমরা আমাদের কুলিদের দৈনিক দুআনা পারিশ্রমিক দিতুম; তাতেই তারা যে কি সন্তোষ লাভ করত তা বলা যায় না! তাদের প্রসন্ন মুখগুলি দেখলে সত্যই আশ্চর্য্য বোধ হ'ত। তাদের ভাবটা এই, সরকার বাহাদুরের কাজের আবার বেতন কি? আমাদের 'পেণ্ড্রী' নামক একটি যায়গায় পর্ণকুটিরে বাস করতে হল। এই স্থানটি বৃক্ষ-বিরল—নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পথে আমাদের যে কতকগুলি পার্ব্বত্য নদ ও নদী অতিক্রম করতে হল সে-

গুলিতে জল প্রায় শুকিয়ে গেছে ; স্থানে স্থানে ক্ষীণ জলধারা নদীর প্রাণের পরিচয়টুকু মাত্র দিচ্চে ! পরদিন 'পাথ্‌রী' নামক স্থানে রওনা হলুম। এখানে পাহাড়গুলি দূরে সরে গেল, আমরা পার্ব্বত্য উপত্যকার সমতল ভূমিতে এসে পড়লুম। এস্থলে আমাদের ডুলির বিবরণ কিছু না দিলে শিল্প-তীর্থযাত্রার ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটি তিন হাত লম্বা খাটিয়া একটা বাঁশেরসঙ্গে পায়ার চারিদিকে কঞ্চি বেঁধে ঝোলান, খাটটিতে বসলে সেটা আবার মাথায় ঠেকে। অর্থাৎ কোনগতিকে ঐ বাঁশের দোলায় একটা বস্তার মত গুটিয়ে গুটিয়ে আমাদের ঝুলিয়ে কুলিরা ক্যাঁচর ক্যাঁচর রব ওঠাতে ওঠাতে সমস্ত পথ নিয়ে চল্ল—সেই গাছের ছালের দড়ি এবং বাঁশের সংঘর্ষে উত্থিত করুণ রোলে যেন 'বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে যাচ্চ চলে শ্মশানঘাটে' এই বাউল সঙ্গীতটি ক্রমাগত ধ্বনিত হতে থাক্‌ল। 'পাথরী'র পথে আমাদের শিল্প-তীর্থাধিপ রামগড়গিরি তাঁর বৃহৎ মস্তক ও নাসিকা নিয়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের মাথা ছাড়িয়ে আমাদের দুর্দ্দশা দেখে রহস্য করবার জন্যেই যেন থেকে থেকে উকিঝুকি দিচ্চেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য আমাদের অবশ্য সে অবস্থায় তাঁর সেই রহস্যে যোগ দিতে কিছু-তেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

আমরা যখন অজন্তা গুহায় চিত্রের প্রতিলিপি নিতে গিয়েছিলুম তখন সেখানে বাঞ্জার নামক এক জাতীয় লোক দেখেছিলুম। এখানেও ঠিক সেই জাতীয় নরনারীদের দেখলুম। তারা গরু এবং ঘোড়ার পিঠে পণ্যভার বোঝাই দিয়ে স্ত্রীপুত্রপরিজনদের নিয়ে পদব্রজে নির্ভয়ে অরণ্যপথে চলেচে।

আমরা পরদিন, উদিপুর, গ্রামের পান্থাবাসের জন্য নির্ণীত স্থানে

যখন পৌঁছলুম, সেখান থেকেও রামগড়গিরি চার মাইল দূরে স্থিত শুনলুম, আমাদের উদিপুরেই তাঁবুতে বাস করতে হবে; কেননা, রামগড় পাহাড়টি এত অরণ্যময় এবং হিংস্রজন্তুসংকুল যে সেখানে শিবিরাবাসে থাকা কোন মতেই নিরাপদ নয়। একটা বিশাল শাখা-প্রশাখাপ্রসারিত অতি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে আমাদের তাঁবু পড়ল। আমরা সেদিনকার মত বিশ্রাম নিলুম।

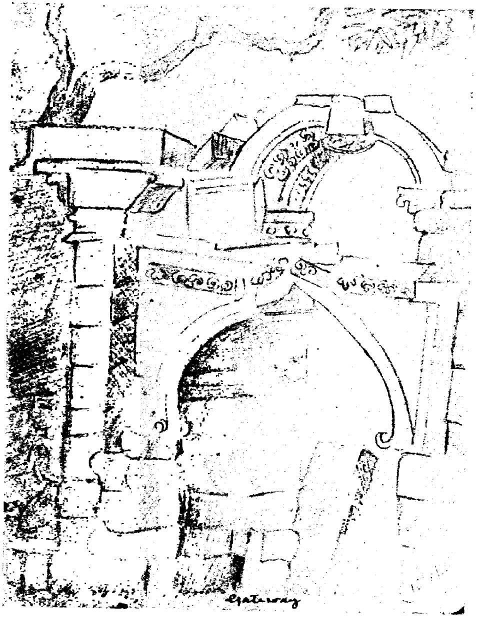
গিরি কাহিনী

গিরি কাহিনী

রামগড় পাহাড়টী তার পাদদেশ থেকে দু হাজার ফুট উঁচু। সেই পাহাড়ের মাথায় একটা অতি প্রাচীন জীর্ণকঙ্কাল মন্দির শৈল-রাজের ভগ্ন কিরীটের মত তাঁর কোন্ স্মরণাতীত যুগের গৌরবের সাক্ষ্য দেবার জন্যেই যেন সেখানে বিরাজ করচে। আমরা প্রথমেই সেই মন্দিরটি দেখতে গেলুম। গজপৃষ্ঠে সমতল ভূমি এবং অরণ্যের কিয়ৎ অংশ পার হয়ে, পরে পদব্রজে প্রথমে খুব চড়াই পাহাড় কতকটা দূর উঠলুম ;—শেষে, একটা উঁচু উপত্যকায় এসে পড়লুম। এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ে মন্দিরে যেতে হয়। সর্ব্বোচ্চ পাহাড়টির গায়ে ঠিক নীচেই ঐ উপত্যকায় একটা ঝরণা ও কুণ্ড আছে। প্রবাদ এই যে এইখানে নাকি সীতাদেবী বনবাসের সময় রাম লক্ষণ সমভিব্যাহারে স্নান করেছিলেন। এই স্থানে প্রতি বৎসর মেলা হয়। তীর্থযাত্রীরা এই ধারাকে অতি পবিত্র ভাগীরথীর চেয়েও পুণ্যপ্রদ বলে মনে করে। আমরা সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর ক্রমে উঁচু পাহাড়টিতে উঠতে লাগলুম। পথিমধ্যে একটা প্রবেশদ্বারের পাথরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলুম, তার কারুকার্য্য কালের করাল গ্রাসে একেবারে অন্তর্হিতপ্রায়।—পূর্ব্বগৌরবের পরিচয়টুকু অতিকষ্টে আবিষ্কার করা যায়। সেটা অতিক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হলে কতকগুলি পাথরের খোদাই করা সতীস্তম্ভের মত স্তম্ভ ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে দেখলুম। এগুলিও এত ক্ষয়প্রাপ্ত যে তার বিশেষ কিছু নির্ণয় করা গেল না। পথের ধারে আর একস্থানে একটা উচ্চ পাথরের বেদীর মত, তার উপরে ওঠবার সিঁড়ির ধাপ তার গায়েই কেটে তৈরী করা। এগুলির তাৎপর্য্য যে কি তা সহজে ধরা যায় না। তার আরও খানিকটা দূরে আবার একটা ছোট্ট নকলমন্দির একটা ক্ষুদ্র পাথরের স্তূপ কেটে তৈরী। এক জায়গায় পথের ধারে একটি নাতিবৃহৎ চৌকো পাথরের গুহার মধ্যেটা ফাঁপা আর তার মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে ক্ষুদ্র দ্বার কেটে তৈরী করা। গুহা এবং দ্বারটি এত ছোট যে শিশু ছাড়া কেহই প্রবেশ করতে পারে না।

এইবারে আমাদের দুরারোহ খাড়াই পাহাড়ের আরও উচ্চ শিখরে উঠতে হল। বন্ধুবর সমরেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি নিরস্ত হলেন। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিষ্টার ব্লাকিষ্টন তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। কোন গতিকে পাহাড়ের উপরে ওঠবার একটিমাত্র পথ তীর্থযাত্রীদের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েচে। অবলম্বনের মধ্যে সামনের পাহাড়ের গায়ের পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি যে কি করে এবং কি সাহসে ঐ পাহাড়ের উপরে উঠেছিলুম যখন নেবে এসে নীচে থেকে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম তখন তা ভেবেই স্থির করতে পারিনি। অনেকক্ষণ ক্রমাগত সরীসৃপের মত পাহাড়ে উঠে যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, তখন সহসা একটা পাথরের চমৎকার কারুকার্য্যখচিত তোরণ দ্বার সম্মুখে দেখতে পেয়ে যে কি আনন্দ হল তা লিখে ব্যক্ত করা যায় না। আবার যখন সেই দ্বারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বেশ পরিচ্ছন্ন পাথরের প্রাচীর ঘেরা



রামগড় মন্দির

রামগড়



রামগড় মন্দির

রামগড়

মঞ্চস্থলের উপর এসে পড়লুম তখন সেখান থেকে দূরের নীচের শৈল-সৌন্দর্য্য যেন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমাদের নিয়ে গেল। এই স্বপ্ন-কুহেলি-মাখা বিরাট ধরার শ্যামল কোলটি যে কি অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় তা সেখান থেকে যা উপভোগ করেছিলুম, চিরদিন আমার মনে জাগরূক থাকবে। আমাদের দৃষ্টিপথে দিকচক্রবালের তরঙ্গায়িত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী যেন নীল বিশ্বকমলের দলের মত সহসা বিকশিত হয়ে উঠল!—সে দিক থেকে চোখ ফেরাতে আর মন চায় না।

এখানকার তোরণ-দ্বারটির দুপাশে দুটি চমৎকার থামের সারে সজ্জিত বারান্দা আর তার একটিতে নাগমূর্ত্তি; তার হাতে, মাথায় সাপ; যোড়হাতে বীরাসনে বসে। মূর্ত্তিটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য ও গঠন-সৌন্দর্য্য এবং মুখখানিতে এমন একটা ভাব-সম্পদোজ্জ্বল কমনীয়তা ফুটে উঠেছে যে সে রকম মূর্ত্তি বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বারের থিলেনের মাঝে একটি সুশোভন আলঙ্কারিক কমল তক্ষিত! আমাদের সেস্থান ত্যাগ করে পুনরায় আরো উপরে উঠতে হ'ল। এবার অল্পকাল মধ্যেই পাহাড়টির চূড়ায়, নিম্নভূমি থেকে দুহাজার ফুট উচ্চে গিয়ে উঠলুম। শীর্ষদেশটি বেশ সমতল। এখানেও একটা প্রবেশ দ্বারের ভগ্ন চিহ্নটুকু মাত্র বিরাজ করচে। কতকগুলি গণপতি, দশভূজা প্রভৃতির মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থেকে থেকে সে গুলির গঠন যদিও নষ্ট হ'য়ে গেছে তবুও তাতে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের বেশ একটু আভাস পাওয়া যায়। পাহাড়ের চূড়ার উপরের মন্দিরটিই রামগড়-মন্দির। এটি যে খুব প্রাচীনকালের নিদর্শন তার গঠন এবং কারুনৈপুণ্যের রীতি

(style) দেখে বেশ বোঝা যায়। মন্দিরটি কতকটা পুরীর ভুবনেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীনকালের মন্দিরের ধরণে (style) গঠিত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্যের এবং পরবর্ত্তী ভাস্কর্য্যের একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীরা কারু-কার্য্যগুলির গঠনের উচ্চতা অর্থাৎ উচু উচু করে (relief করে) কখনও গড়তেন না। পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ উচু করবার দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে। এই মন্দিরের কারুকার্য্যের আকার সমস্তই চ্যাপটা ধরণের। এ থেকে এই মন্দিরটিকে প্রাচীন বলে স্থির করা যায়। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে মন্দিরটি কোনোরূপ মসলা দিয়ে গাঁথা নয়, একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর, এমনি করে সাজিয়ে তৈরী। মন্দিরটির অভ্যন্তরে ছাদের খিলেনও ঠিক ঐ ভাবেই গঠিত। অতি পুরাকালে কোন প্রকার মসলা দিয়ে গেঁথে বাড়ী তৈরী করার রীতি প্রচলিত ছিল না। মন্দিরের মধ্যে ৩।৪ টি বিগ্রহ আছে। একটিতে রাম, লক্ষণ, সীতার মূর্ত্তি খোদাই করা, একটিতে কমণ্ডলু-ধারিণী যোগিনী মূর্ত্তি, অপরটিতে বিষ্ণুমূর্ত্তি, অন্যটি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র। এই মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের পরবর্ত্তী কালের বলেই মনে হয়। বাইরে প্রাঙ্গণে দুয়ারের সাম্‌নে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একটি পিতলের ঘণ্টা তার উপর টাঙ্গান রয়েচে। একটা আধু-নিক প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন ও অর্দ্ধ-ভগ্ন মূর্ত্তি রাখা আছে। এ গুলির অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। কোন্‌টা যে কি তা স্থির করা ও এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এখানেও কতকগুলি সতী স্তূপের মত স্তূপ আমরা ইতস্ততঃ ছড়ান দেখেছি।

আমরা এবার যোগীমারা গুহা দেখবার জন্যে পাহাড়ের নীচে অবতরণ করলুম। কতকদূর নেবে আসার পর আমাদের পথের পাণ্ডা স্থানীয় পূজারী ব্রাহ্মণ পাহাড়ের শীর্ষে এক জায়গায় দুটো দস্যুর মাথার মত বড় বড় কাল পাথর দেখিয়ে বল্লেন 'ও-টি রাবণের মাথা।' আমাদের সে দুটি দেখে আর কিছু বোধের উদয় হোক না-হোক্, পাথরের প্রকাণ্ড অংশটি পাহাড় ছাড়িয়ে আমাদের মাথার সোজাসুজি ভাবে উপরে যে রকম ঝুলে বেরিয়ে রয়েচে তা দেখে আমাদের নিজেদের মাথা বাঁচান সম্বন্ধেই ভাবনা উপস্থিত হল।—এই বুঝি বা পড়ে! পূজারী ব্রাহ্মণটি মন্দিরের ভিতরের প্রতিমাগুলির যে সকল পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতি বিচিত্র! দণ্ড-কমণ্ডলুধারিণী যোগিনী মূর্ত্তিটিকে তিনি যখন 'বালুকি মুনি' নামে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে গেলেন তখন আমারা সেটি যে কি পদার্থ অশেষ সাধনা সত্বেও বুঝতে পারলুম না। শিবিরাবাসে সমস্ত দেখে শুনে ফিরে বন্ধু সমরেন্দ্রের সঙ্গে গবেষণা করে বুঝলুম পুরোহিতপুঙ্গব 'বালুকি' কথাটির দ্বারা বাল্মীকিরই নামকরণ করেচেন মাত্র।

পথে সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ হল। যোগীমারা গুহাটিতেই আমাদের দ্রষ্টব্য চিত্রগুলি ছিল। যোগীমারা গুহায় যাবার পথে আমাদের পাহাড়ের নীচে একটা ১৮০ ফুট স্বাভাবিক সুরঙ্গ পথ পার হতে হল। এই গহ্বর-পথের নাম ডাঃ ব্লক লিখেচেন 'হাতীপোল।' কিন্তু, শুনলুম তার নাম 'হাতী ফোঁড়'—অর্থাৎ গহ্বরপথের আয়তন এত চওড়া যে তার মধ্যে দিয়ে হাতী ফুঁড়ে পাহাড়ের এপার ওপার হয়ে যেতে পারে। সুরঙ্গটির সামনে গেলে মনে হয় যেন একটা ঐরাবতের মত প্রকাণ্ড দৈত্য ভীষণ মুখব্যাদন

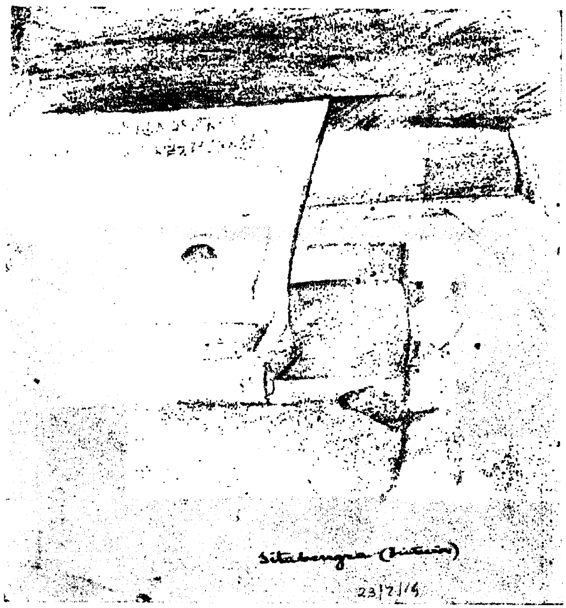
করে অনন্তকাল ধরে তার উদরপূর্ণ আহারের প্রতীক্ষায় বসে রয়েচে! সেই সুরঙ্গটির ভিতরে একধারে প্রবেশ পথের সম্মুখে পাহাড়ের গা থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে নীচের পাথরের উপর পড়চে! সেই স্থানটিতে জল ক্রমাগত প'ড়ে প'ড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একটি গোল পাত্রের আকার ধারণ করেচে। সেখানকার সেই বিন্দু বিন্দু বারিপাতের মৃদু-গম্ভীর শব্দ চারপাশের পর্ব্বত প্রাচীরে গুহা-গহ্বরে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে দ্বিগুণতর বোধ হ'চ্চে,—যেন অনশনক্লিষ্ট গহ্বর-দৈত্যের দানবী ক্ষুধায় তাড়নে তার অশ্রুবারি তার সমস্ত ধমনী শোনিতের নির্য্যাসের মত নিষ্যন্দিত হ'চ্চে! আমরা সেখানকার যুগ যুগান্তের অনন্ত জলবিন্দুধারায় রচিত পাথরের শীতল জলপাত্রটি থেকে অঞ্জলি করে স্বচ্ছ ও অনাবিল জল পানে সকল ক্লেশ দূর করলুম। এই স্থানটিকে একটি রেখারদ্বারা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে চিহ্নিত করা আছে। খুব সম্ভব গুহাবাসীরা এখানকার নির্ম্মল জলই পান করতেন বলে স্থানটি শোভিত করার উদ্দেশ্যে এরূপ চিহ্নিত করে রেখেচেন। সুরঙ্গ পার হ'য়ে পুনরায় খানিকটা পাহাড়ে উঠলে পর যোগীমারা ও সীতাবেঙরা নামক গুহাদ্বয়ের সামনে এসে পড়লুম। পথে একটা গুহা দেখতে পেয়েছিলুম কিন্তু সেটা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাভাবিক গুহা থেকে আদিমকালে গুহাবাসীরা তাদের বাসস্থান কি করে তৈরী করতেন এটিকে তার একটি নিদর্শন বলা যেতে পারে।

সীতাবেঙরা গুহাটিকে ব্লক সাহেব 'সীতাবেঙা' নামে অভিহিত করেচেন, কিন্তু ওদেশীয় লোকে বাসস্থানকে 'বেঙরা' বলে এবং এই গুহাটির সেই হিসাবে নামটি 'সীতাবেঙরা'। এই গুহাটিকে সহসা বাইরে থেকে দেখলে একটা পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক পর্ব্বত-



যেগীমারা

রামগড়



গুহা বলে ভ্রম হয় কিন্তু তার অভ্যন্তরটি দেখ্‌লে সেটিকে স্বাভাবিক গুহা একেবারেই মনে হয় না। কেননা খোদাই করে ভিতরটা বাসের উপযোগী করে গঠিত। ডাঃ ব্লক ও অপরাপর কয়েকটি প্রত্ন-তত্ত্ববিদের মতে এই গুহাটি ভারতের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের একমাত্র নিদর্শন এবং গ্রীকদের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের অনুকরণে তৈরী। গুহাটির বাইরে চারকোনে চারটে বড় বড় ছিদ্র আছে। এ থেকে তাঁরা অনুমান করে স্থির করেছেন যে ঐ গর্ত্তের মধ্যে কাঠের খুঁটি দিয়ে যবনিকা টাঙান হত; আর বাইরের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার নীচে থেকে ক্রমশ উপরের দিকে গুহার ওঠ্‌বার যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়ি-গুলি দর্শকদের বস্‌বার মঞ্চাসনরূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু দ্বারের বাইরের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার ভাবে সিঁড়িগুলি থাকায়, নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে নট ও নটীদের অভিনয় দেখা সম্ভবপর নয়। দর্শকের পশ্চাতে নাট্যমন্দির এবং সম্মুখে দৃশ্যপটটি থাকায় যে কি সার্থকতা আছে তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। গুহাটির দ্বারের বাইরে এমন প্রচুর দাঁড়াবার স্থান নেই যে, সেখানে নৃত্যোৎসবাদি সম্পাদিত হতে পারে এবং ঐ অর্দ্ধবৃত্তাকার সিঁড়িতে বস্‌লে দর্শকেরা সামনে থেকে দেখ্‌তে পায়। সেখানটা আবার ঢালু পাহাড়। তবে, অন্য কোন উপায়ে যদি বাইরে কাঠের স্থায়ী মঞ্চের উপর অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকৃত তা বলা যায় না। কিন্তু তারও কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্লকের রিপোর্টেও এর উল্লেখ দেখিনি। আমাদের মনে হয় এই গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা। প্রাচীনকালে এখানে ছোটখাট গানবাজনার স্থায়ী সভার জন্যে এবং বাসের জন্যে দুই অর্থেই এটিকে এমনভাবে তৈরী করেচে। আর রাত্রে নিরাপদে থাকবার জন্য কোন রকম

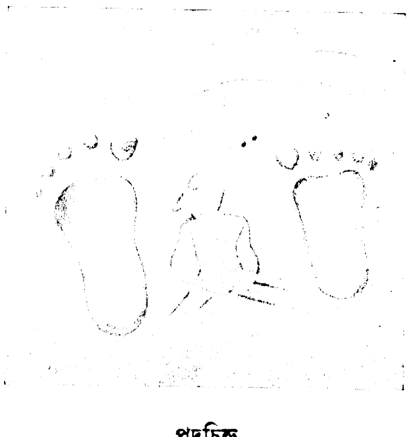
আবরণ দেবার উদ্দেশ্যে ঐ গর্ত্তগুলি গুহার প্রবেশ পথের চার পাশে তৈরী করেছিল। গুহাটির ভিতরের উচ্চতা ছয় ফুট। কোন কোন স্থলে কিছু কমও আছে, সুতরাং ছাদ মাথায় ঠেকে। গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারপাশটা উচু বেদী দিয়ে ঘেরা। এগুলির গঠন খুব স্থাপত্য-বিজ্ঞান অনুমোদিত ত নয়ই বরং বেশ একটু কদর্য্য। একটা বড় নালী ঐ বেদীটির নীচে দিয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেছে। মেঝের উপর কতক-গুলি গর্ত্ত বেশ যত্নসহকারে কেটে তৈরী। এ সকলের উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলা যায় না। উল্লিখিত নালীটির বিষয় একটি মজার প্রবাদ স্থানীয় লোকের কাছে শুনলুম। এই সীতাবেঙরা গুহাটি যে পাহাড়ে অবস্থিত তার বিপরীত দিকে লছমনবেঙরা নামে কতকগুলি গুহা আছে। সেগুলিতেও লোকের পূর্ব্বে বাস ছিল। সে সবগুলিতেও বেদীর মত বসবার এবং শোবার স্থান ভিতরে খোদাই করে প্রস্তুত করা আছে। সেই গুহার মধ্যে একটিতে একটা বৃহৎ নালী আছে! প্রবাদ এই যে বনবাসকালে লক্ষণ উপবাসী থাকতেন বলে জানকী দেবী স্নেহের দেবরকে তাঁর বেঙরা থেকে ঐ নালী দিয়ে শ্রীফলের সরবৎ ঢেলে দিতেন, লক্ষণ তাঁর ঘরে বসে সেই অমৃততুল্য পানীয় পান করে বনবাসের অনশনক্লেশ অপনোদন করতেন। সীতাবেঙরা গুহার মধ্যে ধনুকতূণীরধারী রামলক্ষণের একটি ভগ্ন বিগ্রহ রাখা আছে। বাইরের দক্ষিণদিকের দেয়ালের উপর একপাশে একটি পাদযুগলের ছাপ আর তার মাঝে খোদাই করা রেখার দ্বারা আঁকা একটি মল্লের মূর্ত্তি। পাথরের অঙ্কিত পদচিহ্নের উপর বৃষ্টি পড়েই হোক বা আপনা থেকেই হোক কাঁচামাটিতে পা চেপে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়ে আনলে যেমন



লছমন বেঙরা
রামগড়



লছমন বেঙরা
রামগড়



পদচিহ্ন

দাগটা দেখায় এটিও ঠিক সেই রকম। স্থানীয় লোকেরা সেটিকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মবলে অভিহিত করে থাকে।

এই সকল রহস্যজনক ব্যাপার দেখে আমরা যোগীমারা গুহায় গেলুম। এই গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা। লম্বায় ১০ ফুট চওড়ায় ৬ ফুট মাত্র। এরই ছাদের নীচে কতকগুলি লাল রেখাদ্বারা ভাগে ভাগে আঁকা ছবি আছে। ছবিগুলিতে নীচে দাঁড়িয়ে সহজেই হাত পাওয়া যায়। গুহাটিতে আলোর কোনই অসদ্ভাব নাই। সমস্তটাই খোলা। ছাদের এক পাশে একটা আলোক-পথের মত বড় ছিদ্রপথও আছে। এত আলো থাকতেও ঐ ছিদ্রের প্রয়োজনীয়তা যে কি হতে পারে তা বলা যায় না!

লছমনবেঙরা, যোগীমারা প্রভৃতি ছাড়া আরো অনেকগুলি স্বাভাবিক গুহাকে বাসোপযোগী করে বাটালী দিয়ে কেটে তৈরী করা হয়েচে, এবং কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এক একটি গুহায় সহসা প্রবেশ করা দুরূহ। কতকগুলিতে প্রবেশ করার আশা একেবারেই ত্যাগ করতে হ'য়েছিল। একটা স্বাভাবিক গুহা আছে তার বাইরেটা একেবারে একটা ঠিক চোখের মত হুবহু দেখতে। বৌদ্ধ গুহার সঙ্গে রামগড়ের গুহা-গুলির কোন সাদৃশ্য নেই বা বৌদ্ধ আমলের কোন চিহ্নও কিছুই নেই।

আমরা প্রায় দু মাস শিবিরনিবাসে সেখানে অবস্থান ক'রে, পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনে ফেরবার পথে অপর একস্থানে একটি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলুম। এটি একটি রাজপুতদের মন্দির। ভিতরে কোন প্রতিমাই নেই। রামগড়ের সতীস্তম্ভের চেয়ে ভাল অবস্থার কতকগুলি স্তম্ভ মাটিতে এখানে সেখানে পোঁতা

আছে। এ গুলি যে সতীস্তম্ভ তা তার কারুকার্য্য দেখলেই জানা যায়। স্তম্ভের ঊর্দ্ধদেশে একটী অলঙ্কার শোভিত স্ত্রীহস্ত এবং অধোদেশে অশ্বারোহিমূর্ত্তি সম্ভবত রাজপুতের প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থানটি পর্ব্বতের অত্যুচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত। পথের অন্যান্যস্থানের দৃশ্য অপেক্ষা এই স্থানটিতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের এক বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য ছিল। হরিতকী, আমলকী, শাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ প্রায় নেই। এখানে চারিপাশে সবুজ বাঁশের বন, যেন 'হরিয়ার ফোয়ার' চল্‌চে! বাতাসে যখন বাঁশের অগ্রভাগের নত ও নবীন-শাখাগুলি আন্দোলিত হয় এবং সেই সঙ্গে তার কচি কচি পাতাগুলি উৎস উৎক্ষিপ্ত জল-কণিকার মত বারবার পবন-তরঙ্গে নৃত্য করতে থাকে, তখন হঠাৎ দেখলে সত্যই শত শত সবুজ-ফোয়ারা বলেই ভ্রম হয়!

চিত্র

যোগীমারা গুহার চিত্রগুলি প্রথম দর্শনেই আমাদের বাঙ্গলা-দেশের প্রাচীন পাটার অতি নিকৃষ্ট উদাহরণের কথাই মনে হয়েছিল। আমারা নকল নেবার সময় পরে কতকগুলি ছবির নীচের রঙ, যা উপরের অন্য রঙে চাপা পড়ে গেছে (দুএক স্থানে উপরের বর্ণ উঠে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েচে) দেখেছি তাতে মনে হয় যে, পূর্ব্বে উৎকৃষ্টতর উদাহরণেরও হয়ত গুহাটিতে অসদ্ভাব ছিল না। পরবর্ত্তী কোন শিল্পী (অবশ্য অতি প্রাচীন কালেই) পুনরায় রঙ দিয়ে ঐ সকল চিত্র ঢেকে তাঁর নিজের চিত্রচাতুর্য্যের নমুনা রেখে গেছেন।

চিত্রের দক্ষিণ দিকের প্রথম অংশে কতকগুলি লোক একটা

হাতীকে তাড়া কর্‌চে আর তার নীচে সাদা লাল এবং কাল রঙের আলঙ্কারিক রীতিতে আঁকা কয়েকটি অদ্ভুতদর্শন মকরের ছবি। সেগুলি যে জলের মধ্যে বিচরণ কর্‌চে পাছে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ জন্মায় সেই ভয়ে শিল্পী গোটাকতক গোল গোল কাল কাল রেখার তরঙ্গ তুলে বুঝিয়ে দিয়েচে।

২য় অংশে একটি তরুতলে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট। কি কর্‌ছে বোঝা যায় না! বৃক্ষটিকে একটি গুঁড়ির উপর কয়েকটি ডাল আর দুচারটে পাতা এঁকে দেখান হয়েছে। পাতা আর গাছের রঙ লাল।

৩য় অংশে একটি উদ্যান সাদা জমীর উপর কাল রেখা দিয়ে অঙ্কিত। বাগানটি আশ্চর্য্যভাবে কতকগুলি শুধু কুমুদ পুষ্পের মত ফুল এঁকে দেখান হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষের যুগলমূর্ত্তি একটি ঐ প্রকার বিচিত্র ফুলের উপর হাত ধরাধরি করে নৃত্য করচে! মনুষ্যমূর্ত্তি লাল রেখায় আঁকা, হাত, মুখ, পা, লাল রঙে একেবারে ভরান। চোখ নাকের খোঁজ তাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। ফুলগুলিতে কোন রঙই নেই, চিত্রের সাদা জমীটাই তার বর্ণ।

৪র্থ খণ্ডের চিত্রগুলি ভারি বিচিত্র! কতকগুলি 'হাত নলী নলী পা সরু, পেট ডাগ্‌রো গাল পুরু' মাটির ছেলেভোলানো খেলনার মূর্ত্তির মত লাল রংএর মনুষ্যমূর্ত্তি। আবার তার চোখের ভিতরগুলি সাদা এবং ধারে চারিপাশে কাল রেখাদ্বারা সিয়াকলম * ক'রে ফোটান। মূর্ত্তিগুলির কৌতুকাবহ চোখের ভাবের বা

* ভারতবর্ষীয় চিত্রশিল্পীদের রীতিতে পূর্ব্বে ছবি আঁকার শেষে বিশেষ কাজ হচ্চে যথাযথস্থানে কালো রেখা দিয়ে ছবিকে ফুটিয়ে তোলা। মোগল শিল্পীরা পূর্ব্বে এই কাজটিকে 'সিয়াকলম' বলতেন। আধুনিক কালীঘাটের পোটোদের মুখেও এই কাজকে ঐ নামেই বল্‌তে শুনেচি।

গঠনের ভঙ্গী দেখলে সত্যই হাসি ধরে রাখা যায় না! মূর্ত্তির অবয়বের সীমারেখাগুলিও সিয়াকলম করা। একটা মানুষের মাথায় একটা পাখীর চঞ্চুটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে—তার কারণ বা উদ্দেশ্যের বিষয় জান্‌বার কা'রো প্রয়োজন হ'লেও জানবার উপায় নেই! এ রহস্য চিরকালই অজ্ঞাত থাকবে!

৫ম চিত্রে একটি মহিলা আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসে আছেন; কতকগুলি গায়ক ও বাদক নৃত্যগীতে মেতে আছে। এই ছবিটির রেখা এবং অঙ্কনচাতুর্য্য অজন্তার নিকৃষ্ট চিত্রের লীলায়িত তুলিকার সঙ্গে কতকটা মেলে। অজন্তার নৃত্যগীতোৎসবের একটা ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবে সেটির মত উৎকৃষ্ট ছবি এটি একেবারেই নয়। ফল কথা, রামগড়ের সমস্ত ছবির মধ্যে এই ছবিটিতেই একমাত্র শিল্পীর তুলির টানের পরিচয় পাওয়া যায়।

৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ডের ছবিগুলি ক্রমেই অদ্ভুত ও অস্পষ্ট আকার ধারণ করেচে। চৈত্য মন্দিরের মত কতকগুলি প্রাচীন গৃহের চিত্রও কয়েকটি স্থানে আছে। আদিম যুগের রথের চিত্রের নমুনা কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের এবং প্রাচীন গ্রীসের রথের একটা আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার চিত্রেও অবশ্য অন্যথা হয়নি। তবে দুর্ভাগ্যবশত কোন্ দেশের রথের অনুকরণ কোন্ দেশ করেচে সে বিষয় স্থির মীমাংসা করার শক্তি আমার নেই; অতএব সে ভার প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতেই ন্যস্ত রইল। অজন্তার ভিত্তি-গাত্রের এবং ছাদের নীচের চিত্রগুলি যেমন গোবরমাটি তুঁষ প্রভৃতি দিয়ে পাথরের দেওয়ালের উপর একটা উচু ও সমতল জমী তৈরী ক'রে তার উপর আঁকা, এখানকার চিত্রগুলি সেরকম

কোন একটা বিশেষভাবে পটভূমি তৈরী করে বা সযত্নে আঁকা হয়নি। মাত্র সাদা, কালো এবং লাল এই তিনটি বর্ণ ছাড়া কোন বর্ণই চিত্রগুলিতে নেই। কয়েকস্থলে পীতবর্ণ দেখা গেলেও সেগুলি লাল গৈরিকেরই প্রাচীন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি 'পথের কথায়' পূর্ব্বে যে সাদা মাটির বিষয় উল্লেখ করেছি চিত্রের সাদা রঙ সম্ভবত সেই রকম মাটি থেকেই উৎপন্ন। কেননা, এই স্থানে দুহাজার ফুট উচু পাহাড়ের উপর রামগড় মন্দিরের নিকটেই তীর্থযাত্রীদের তিলক মাটির জন্যে ব্যবহার করবার উৎকৃষ্ট সাদামাটি একটি গুহাভ্যন্তরে প্রচুর পাওয়া যায়। ঘন গৈরিক রঙের পাথর পর্ব্বত প্রদেশে বিরল নয়। মসীকৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তুত করা রামগড়ের অরণ্যবাসীদের পক্ষে খুবই সহজ। কেন না, হরিতকীভস্ম থেকে প্রাচীন কালে খুব উৎকৃষ্ট কালী তৈরী হ'ত। রামগড়ের বনকে হরিতকীকানন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। স্পষ্ট বোঝা যায় রঙ দিতে বা প্রস্তুত কর্‌তে কোনোটাতেই অজন্তার শিল্পীর মত এখানকার শিল্পীরা দক্ষ ত নয়ই, বরং নিতান্ত অপটু-পটুয়া বলেই বিশ্বাস জন্মে। খালি সাদা রঙ পাহাড়ের অসমতল পাথরের গায়ের উপর লেপন ক'রে ছবি আঁকার জমী তৈরী করা হয়েচে আর তারই উপর অবলীলাক্রমে আঁকাও হ'য়েছে। মোটের উপর, রামগড়ের চিত্রে একটা নির্ব্বিচার উৎসাহ এবং সাহসের পরিচয় পেয়ে আমরা ভারি একটা আনন্দ অনুভব করেছিলুম।

শিলালিপি

রামগড়ের সীতাবেঙ্‌রা এবং যোগীমারা গুহা দুটিতেই প্রাচীর গাত্রে গভীর গর্ত্ত করে শিলালিপি খোদাই করা আছে। সে দুটিতে একজন নটীর এবং একজন ভাস্করের প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করা। ডাঃ ব্লক অধ্যাপক লুঁদার্স প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করেচেন এই লিপির অক্ষরগুলি অশোকের আমলের লিপির মত পুরাতন। এই শিলালিপি ধরেই এই স্থানের গুহাগুলির প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। ডাঃ ব্লক অজন্তাগুহা, সিগিরিয়া প্রভৃতির চিত্র অপেক্ষা যোগীমারার চিত্রই অধিক প্রাচীন বলে নির্ণয় করেচেন। Archaeological Survey of India, Annual Report (1903-4)তে ব্লক সাহেব রামগড়গিরির প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যা যা আলোচনা করেছিলেন, লিখেচেন।

ডাঃ ব্লক শিলালিপিগুলির নিম্নলিখিতরূপ পাঠ করেন :—

যোগীমারা শিলালিপি

(অশোকের আমলের প্রচলিত ব্রাহ্মী হরফে মাগধী ভাষায় লেখা)

মূলঃ (১) শুতনুক নম (২) দেব দশিক্যি।
(৩) শুতনুক নম। দেব দশিক্যি।
(৪) তং কময়িথ বল্ [অ] ন শেয়ে।
(৫) দেব দিনে নম। লুপদখে।

পাঠঃ (১) শুতনুক নামে (২) একটি দেব দাসী।
(৩) শুতনুক নামে। একটি দেবদাসী।
(৪) যুবকদের মধ্যে উৎকৃষ্ট লোকেরা তাকে ভালবাসত।
(৫) দেবদীন নামক নিপুন ভাস্কর।

সীতাবেঙ্গা শিলালিপি

(অশোকের আমলের প্রচলিত ব্রাহ্মী হরফে প্রাকৃত ভাষায়, কবিতার ছন্দে লেখা)

মূলঃ (পং১) অদিপয়ংতি হৃদয়ং। সভাব-গরু কবয়ো এ রাতয়ং......

(পং২) দুলে ব্‌সংতিয়া হাসাবানূভূতে। কুদস্ফতং এবং অলং গ্‌[ত্‌]

পাঠঃ (পং১) স্বভাবত শ্রদ্ধাভাজন কবি চিত্তকে যিনি জাগিয়ে তোলেন, যিনি......

(পং২) বসন্ত-পূর্ণিমার দোলোৎসবে, যখন প্রচুর আনন্দ এবং গীতবাদ্য হয় তখন লোকে এইরূপ (?) যুথিকা-প্রচুর ফুল (ফুলের মালা) গলায় ধারণ করে।

ডাঃ ব্লকের উল্লিখিত পাঠ ছাড়া শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয় The Indian Antiquary (July. 1919) তে যোগীমারা শিলা-লিপি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর পাঠ ও ডাঃ ব্লকের পাঠের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয়ের পাঠ থেকে জানা যায় যে গুহাগুলিতে সাধারণ নর্ত্তক নর্ত্তকী থাকত না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ আরো অনেক দেশী বিদেশী পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি।

ডাক্তার ব্লক সীতাবেঙরা ও যোগীমারা গুহা দুটিতে নটীর নাম উল্লেখ আছে দেখে সে দুটির মধ্যে সীতাবেঙরাকে গ্রীকদের নকলে তৈরী নাট্যমন্দির বলেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাঃ ব্লক রামগড়ের

প্রাচীন মন্দিরটির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোন আলোচনা করেন নি। কিন্তু আমাদের ঐ মন্দিরটি এবং গুহাগুলি দেখে মনে হ'য়েছিল যে, এই সকল গুহাবাসীদের সঙ্গে মন্দিরের কোন-না কোন বিষয়ে যোগ ছিল। কেননা, প্রাচীন ভারতে মন্দিরের দেবসেবার উদ্দেশ্যে নৃত্য-কলাভিজ্ঞা দেবদাসী নিযুক্ত থাক্‌ত, তাদের নাচের ভঙ্গীর দ্বারাও দেবার্চ্চনার একদিকের কাজ অনুষ্ঠিত হ'ত। পূর্ব্বকালের রীতি অনুযায়ী এখনও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মন্দির গুলিতে ঐরূপ নৃত্য-কলার প্রচলন আছে। সেই হিসাবে রামগড়ের মন্দিরটিতেও যে নটী নিযুক্ত ছিল একথা বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে এবং সেই দেবদাসীদের সঙ্গে গুহার গুহাবাসীদেরও যে একটা যোগ ছিল, একথাও নিতান্ত আনুমানিক নয়।

কেন জানিনা, আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে বুন্দেলখণ্ডের রামটেক এবং এই রামগড়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত মেঘ-দূতের কবিবর্ণিত রামগিরি? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কেন জানিনা বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত পর্ব্বতকেই রামগিরি বলেন। কিন্তু যদি মেঘদূতের 'জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদক' কিম্বা বাল্মীকিবর্ণিত চিত্রকুট পর্ব্বতের বৃক্ষাদির দ্বারা স্থানটির নির্দ্দেশ করতে হয় তবে রামগড়কেও অনায়াসে রামগিরি বলা চলে। রামটেকের চেয়ে রামগড়কেই রামগিরির অপভ্রংশ বলা যেতে পারে।* রামগড় নামক স্থান ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আছে সত্য, কিন্তু এখানে রামের বিষয়ে

* ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে রামগড়ের বিষয় আমার প্রবন্ধ বাহির হবার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে "রামগড় কি রামগিরি?" এসম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। তাঁরাও বুন্দেলখণ্ডের রামটেক অপেক্ষা রামগড়কেই কালিদাস বর্ণিত রামগিরি বলে অনুমান করেন।

যত প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে, অপর কোন খানেই তা নেই। দুঃখের বিষয় এই, রামগড়ের প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন ইতিহাসই আবিষ্কৃত হয়নি। তার প্রধান কারন এই স্থানটি সহজগম্য ত নয়ই বরং দুরধিগম্য।

19 MAR. 19..
COOCH-BEHAR.

পরিশিষ্ট

বাগগুহা

বাগগুহা অজন্তাগুহার উত্তর পশ্চিম দিকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে Lieutenant Dangerfield সাহেব Transactions of the Bombay Literary Societyর দ্বিতীয় খণ্ডে বাগগুহার বিষয় প্রথমে বর্ণনা করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে Dr. E. Impey সাহেব The Journal of the Bombay Branch Asiatic Societyর পঞ্চম খণ্ডে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন। Dr. Impey যে সমস্ত ছবির প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি প্রকাশিত না হওয়ায় চিত্রের বিষয় অনেক তথ্য এখন জানা যায় না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে Major Luard সাহেব যখন চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করে আসেন তখন ছবিগুলির অবস্থা দেখে তিনি আগষ্ট সংখ্যায় Indian Antiquaryতে সেগুলির নকল করা অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে ছমাস বাস করে একজন চিত্র-শিল্পীর সাহায্যে গুহাগুলির নক্সা ও কতক-গুলি চিত্রের নকল করেছিলেন। সেই ছবিগুলি এখন গোয়ালি-য়ার রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে আছে। আমাদের নকল নেওয়া হয়ে গেলে পর উল্লিখিত Luard সাহেবের নকলগুলি আমাদের তিনি দেখিয়েছিলেন। সেগুলি দেখলে চিত্রে কোথায় কি মূর্ত্তি আঁকা আছে সেইটুকু মাত্র জানা যায়, বাগের চিত্রকলার হুবহু নকল সে গুলি নয়। বারান্দার যে অংশের ছবি আমরা নকল করিনি তার বিবরণ 'চিত্রকলা' প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল। এইসব চিত্রগুলির এর পূর্ব্বে কোনো বর্ণনা কেহই প্রকাশ করেন নি।

পরিশিষ্ট

চিত্রগুলি নকল করবার বিষয় গোয়ালিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গার্দ্দে মহাশয় এবং তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত বিষ্ণু জগতাপ মহাশয়েরা যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। পুস্তিকা রচনা কালে আমার বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অনেক কথা মনে পাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় ও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শ্রীমান সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ও শ্রীমান অমূল্য প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছেন।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় এই গ্রন্থ ছাপার প্রধান উদ্যোগী এই জন্যে তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রামগড়

রামগড় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ Dr. T. Bloch এর লেখা Archaeological Survey of India র Annual Report 1903-4তে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া অপর কোথাও এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। Dr. T. Bloch রামগড়ের যোগীমারা গুহার চিত্রগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি যথাযথ বলে মনে হয় না। আমরা ছবিগুলির নকল নিয়েছিলুম সুতরাং যথাযথ ভাবে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুহার শিলালিপি পাঠের অংশটি ছাপার বিষয় বিশেষ সহায়তা করেছেন সেজন্যে তাঁর কাছে ঋণী আছি। বাগ ও রামগড়ের ছবির ব্লকগুলি প্রবাসী ও Modern Reviewর সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবহার করতে দিয়ে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন।